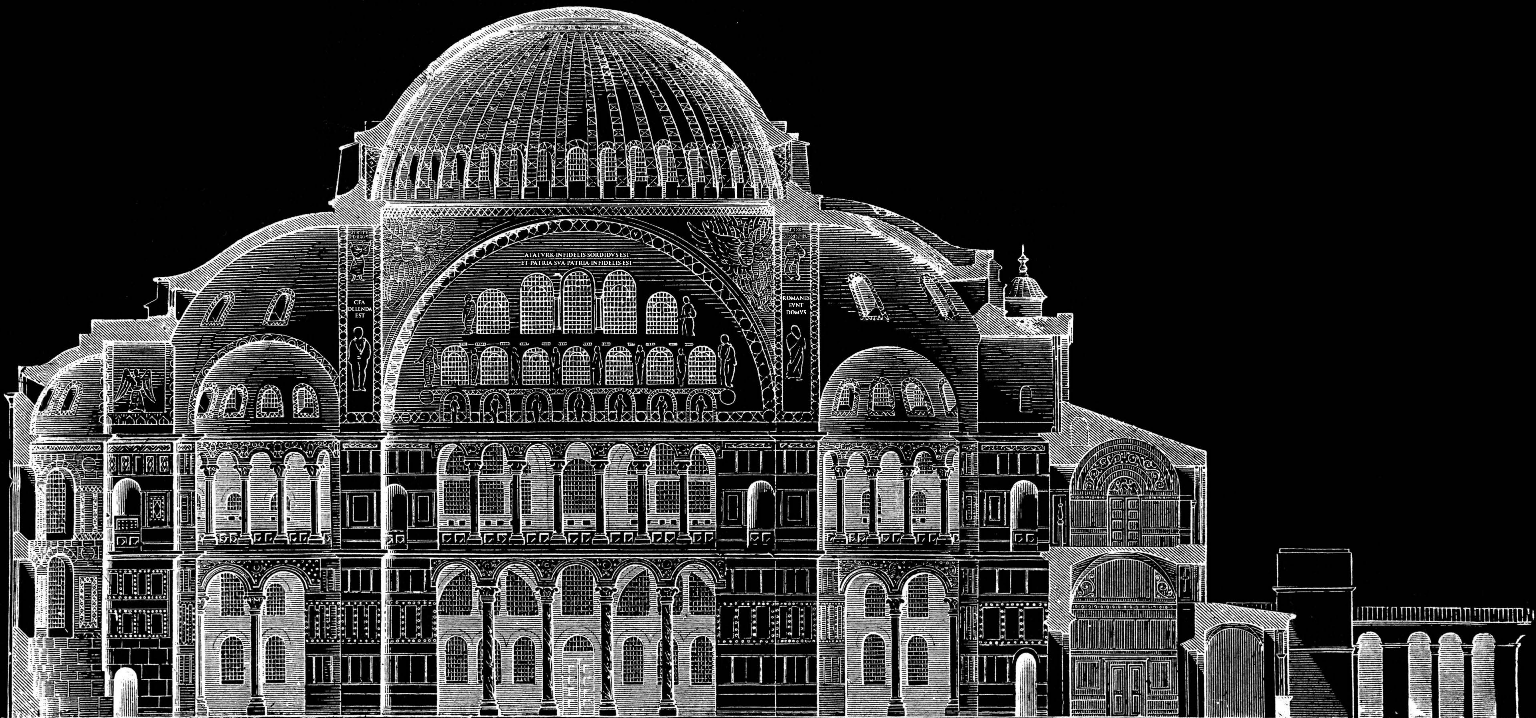
শেষ দিবসের হাদিসে রূম বলতে কোন জাতিকে বুঝানো হয়েছে?



মুসা সেরান্টোনিও

শেষ দিবসের হাদিসে রূম বলতে কোন জাতিকে বুঝানো হয়েছে?

মুসা সেরান্টোনিও

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর সুবহানাহু ওয়া তা'আলার যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং দেখিয়েছেন সরল পথ। দুরুদ ও সালাম নাযিল আল্লাহর নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদ বিন 'আব্দুল্লাহ ﷺ এর উপর যিনি যথাযথভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর নবুওয়্যাত পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করেছেন।

কেয়ামতের আগের বড় ঘটনাগুলো নিয়ে প্রায় সব মুসলিমের মাঝেই রয়েছে কৌতুহল ও উৎসাহ। 'ইলমুল গাইব (অদৃশ্যের জ্ঞান) হিসেবে এই বিষয়টি মুসলিম সমাজে ব্যাপক আলোচিত। সেই সাথে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে রয়েছে সংশয়, ভুল বুঝাবুঝি ও মতপার্থক্য। কেয়ামতের আগের একটি বড় ঘটনা হল আল-মালহামা (সবচেয়ে বড় যুদ্ধ)। এই যুদ্ধ হবে মুসলিমদের ও রোমানদের মাঝে। তবে রোমান বা রুম বলতে ঠিক কাদের বোঝানো হচ্ছে তা নিয়ে ব্যাপক দন্দ্ব ও মতপার্থক্য রয়েছে। সঠিক জ্ঞানের অভাব ও বিচার-বিশ্লেষনের অপ্রতুলতার কারণে আজ পর্যন্ত এই ব্যাপারটি ধোঁয়াটে হয়ে আছে। এই লেখায় লেখক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সহীহ হাদিস দ্বারা এই প্রশ্নের একটি বাস্তবসম্মত সমাধান দেবার চেষ্টা করেছেন যা যুক্তি, বিশ্লেষন ও দলিল প্রমাণের মানদন্ডে সঠিক বলে সকলেই স্বীকার করবেন বলে আমি মনে করি।

উপরন্তু এই বইটি আমাদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী কারণ এতে কেয়ামতের পূর্বের কিছু বড় বড় নিদর্শন নিয়ে খুব ভাল আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা আমাদেরকে লক্ষনগুলো ভাল করে চিনে পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে সঠিক পথটি বেছে নিতে সাহায্য করবে। এই বইটি নিছক কোন গল্প বা উপন্যাস নয়। এতে আমাদের সময়ের মুমিন ও মুনাফিক/কাফেরদের পরিচয় পাওয়া যাবে।

এই বইটি অনুবাদের সময় আমি চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব সহজ সরল ভাষা ব্যাবহার করার। সেই সাথে এও চেষ্টা করেছি যেন তা লেখকের কথার হুবহু অনুবাদ হয়। আমি যেকোন ভুল-ভ্রান্তির জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এই কাজ আমি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করেছি। আমি আশা করব পাঠকগণ এই বইয়ের লেখক ও আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুয়া করবেন যেন আমাদেরকে কেয়ামতের দিনের ভয়াবহতা হতে রক্ষা করেন, জাহান্নাম হতে আমাদের মুক্তি দান করেন, আমাদের গুনাহ ক্ষমা করেন এবং জান্নাতে মুমিন ভাইদের সাথে আমাদেরকে একত্রিত করেন।

কেন রোম জাতির পরিচয় জানা এত জরুরী?

ইসলামে শেষ দিনের আলোচনা ও পড়ার ক্ষেত্রে প্রায় অবধারিতভাবেই কোন না কোন সময়ে রোম জাতির উল্লেখ আসবেই। শেষ দিবসের সময়ে ঠিক কোন জাতিটি রুম বলে পরিগিণিত হবে তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে এবং এ সম্পর্কে নানাবিধ মতামতের ছড়াছড়িও দেখে বুঝা যায় যে এই বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন মতৈক্যে পৌঁছানো যায়নি। যে বিষয়টি এখনো পর্যন্ত সংঘটিত হয়নি তা নিয়ে বিতর্ক থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে এই বিষয়ে গবেষনাকারীদের জন্য এটি এক নিতান্তই আশ্চর্যের বিষয় যে রোম জাতির প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে খুব কম আলোচনাই বিদ্যমান আর এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও মুসলিম ওলামাদের ঐক্যমত খুঁজে পাওয়াও দুষ্কর। এই বিষয়ে বিবিধ মতামতের সম্মুখীন হয়েছেন এমন লিখকদের কাছে গ্রহনযোগ্য একটি সুনির্দিষ্ট মতামতের অভাবের কারণে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে রোমের পরিচয় সম্পর্কিত প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর এখনো অজানা রয়ে গেছে এবং এটি এমন একটি বিষয় যার ব্যাপারে পর্যাপ্ত আলোচনা করা হয়নি। এর ফলে অনেকেই বিষ্ময় প্রকাশ করেছেন যে এর উত্তর কি কেয়ামতের আগে পর্যন্ত অজানাই থেকে যাবে? আর যদি এর উত্তর পাওয়াও যায় তবে পর্যাপ্ত পরিমাণ তথ্যের কারণে তা কি সীমাবদ্ধ জ্ঞান ভিত্তিক হবে?

আমি উদ্যোগ নিয়েছি এই বিষয়ের উপর সকল মতামত জানব ও শুনব এবং সেই সাপেক্ষে আমি নিজে এই বিশাল গুরুত্ববহ প্রশ্নটির একটি উত্তর দেব। তাই ব্যাপক আলোচনার ভিত্তিতে আমি আমার বিশ্বাসভাজন ব্যাক্তিবর্গের উপর এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করার ভার প্রদান করেছি। তাঁরা সকলেই আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন আমি যেন আমার নিজের অনুসন্ধানের ফলাফলগুলো তাঁদের সাথে শেয়ার করি যাতে এই বিষয়ে কমপক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে হলেও কিছু আলোচনা হয় এবং যতদূর সম্ভব মুসলিম উম্মাহকে এই ঘটনার ব্যাপারে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহনের দিকনির্দেশনা দেয়া যায়। আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে দুয়া করি তিনি যেন এই কাজকে বরকতময় করেন এবং যে সকল মুমিন এটি পড়বেন তারা যেন এ থেকে লাভবান হতে পারেন।

শেষ দিবসের পূর্বের নিদর্শনগুলি চিহ্নিত করা

উম্মত হিসেবে আমাদের উপর একটি বিশেষ মেহেরবানি হল এই যে আল্লাহ আমাদের শুধু আমাদের পূর্ববর্তীদের ব্যাপারে অবগত করেছেন তা-ই নয়, তিনি আমাদের ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর ব্যাপারেও কিছু আলামত দিয়েছেন। কুরআন ও রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদিসসমূহ যেমন করে আমাদেরকে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনা বর্ণনা করতঃ শিক্ষা দেয় তাদের সাথে কি হয়েছিল, ঠিক তেমনি কেয়ামতের দিন পর্যন্ত সামনের দিনগুলোতে আমাদের জাতির ভাগ্যে কি ঘটবে তাও বর্ণনা করে। এটি আমাদের প্রতি এক বিশেষ অনুগ্রহ যা আমাদেরকে ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর জন্য সঠিকভাবে পূর্বপ্রস্তুতি নিতে সাহায্য করে। তবে এর-ই সাথে এর একটি দাবী হল আমাদেরকে এই ভবিষ্যৎবাণী এবং ওহী সমূহের বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত উভয় অর্থ সঠিকভাবে বুঝতে হবে।

কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ের নিদর্শনসমূহের দিকে আলোকপাত করলে দেখা যায় যে এদের কিছু খুব সহজেই বুঝা যায় অন্যদিকে কিছু ঘটনা প্রায় নিশ্চিতরূপেই অনুধাবন করা অসম্ভব যতক্ষন না বর্ণিত ঘটনাটি ঘটছে। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল ভবিষ্যতবাণী যার কথা কুরআনের সুরা রুম-এর প্রথম কয়েকটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

غُلِبَتِ الرُّومُ فِيْ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ

"রোমান জাতি পরাজিত হয়েছে, নিম্নতম ভুমিতে কিন্তু তাদের এই পরাজয়ের পর তারা আবার বিজয়ী হবে তিন হতে নয় বছরের মধ্যে" (৩০:২-৪)।

এই আয়াতটিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে কি হবে এবং কখন তা হবে। রোম জাতি, যারা পারস্যদের কাছে পরাজিত হবার পর রোমানরা শিঘ্রই আবার বিজয়ী হয়ে শক্তিশালী পারস্য সাম্রাজ্যের উপর তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে। যে সময় পরিসরে এই ঘটনা ঘটার ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে তা আরবী শব্দ "ফি বিদ'য়ি সিনিন" অর্থাৎ ৩-৯ বছরের ব্যবধানে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ভবিষ্যতবাণীটি ঘটনাটি ঘটার আগেই করা হয়েছে এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশাতে এটি হুবহু সেইভাবেই ঘটে যেভাবে এর ব্যাপারে ওহী করা হয়। এই ঘটনার ক্ষেত্রে কি ঘটবে এবং কখন ঘটবে তার ব্যাপারে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই তাই এই আয়াতগুলো দ্বারা কি বুঝানো হচ্ছে সেই ব্যাপারে

সন্দেহের কোন অবকাশ নেই তাই এটি পড়া বা শুনার পর আমরা একে একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ওহী বলে গণ্য করতে পারি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর প্রসিদ্ধ 'হাদিসে জিবরিল' হতে কেয়ামতের আগমনের পূর্বের আলামত সম্পর্কিত অস্পষ্ট ভবিষ্যতবাণী সম্পন্ন একটি ওহীর উদাহরণ দেয়া যেতে পারে এভাবেঃ

وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ

"উটের রাখালেরা পরস্পর প্রতিযোগিতা করবে কে কত উঁচু দালান তৈরী করতে পারে এবং তারা তা নিয়ে অহংকার করবে" (সহীহ বুখারীঃ ৫০)।

প্রায় কোন সন্দেহের অবকাশ না রেখেই একথা বলা যায় যে এর দ্বারা গত দশকে আরবে শুরু হওয়া হাল আমলের ফ্যাশন, বিশ্বের সর্বোচ্চ দালান তৈরীর প্রতিযোগীতাকে বুঝানো হচ্ছে। গত চার বছরের মাঝেই বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু দালান দুটি তৈরী হয় আরব আমিরাত ও সৌদি আরবে এবং তৃতীয় ভবনটিও সৌদি আরবে নির্মিতব্য যার নির্মাণ কাজ শেষ হবার পর এটি হবে বিশালকায় ১ কিঃমিঃ উচ্চতা সম্পন্ন। এই দালানগুলোর ব্যাপারে সবচেয়ে আশ্চর্য্যজনক বিষয় হল গত অর্ধশতাব্দী যাবত আরব জাতির দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির সাধিত হয় এবং এই দালানসমূহের নির্মাণ কাজের সাথে জড়িত অনেকেই এসেছে বেদুইন পরিবার হতে যারা রাতারাতি বিলিয়নিয়ার হয়ে গিয়েছে। ২০১০ সালে আমার আরব আমিরাতে বুর্জ খলিফাহর একজন কন্সট্রাকশন ম্যানেজারের সাথে আলাপ হয় এবং তিনি আমাকে বলেন যে তিনি বেদুইন পরিবারের সন্তান। ছেলেবেলার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন যে ঐ সময় খালি পায়ে খেলাধুলা করতেন এবং তাঁর পরিবার উট ও ছাগল চরাত। তাই আমরা দেখতে পাই যে আমাদের চোখের সামনে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর দেয়া পূর্বাভাস হুবহু সেইভাবেই বাস্তবায়িত হয়েছে যেভাবে হাদিসের কথায় বর্ণিত আছে। কিন্তু যেহেতু এই ভবিষ্যতবাণীতে সুনির্দিষ্ট বর্ণনা যেমন এই ঘটনাটি ঘটার কোন সুনির্দিষ্ট জায়গা বা সময় পরিসরের কোন উল্লেখ নেই তাই আমাদের আগের যুগের লোকদের পক্ষে এটি চিন্তা করা অসম্ভব ছিল যে তা ঠিক এই জায়গায় বা ঠিক এই বছরগুলোতে ঘটবে।

ভবিষ্যতবাণীগুলোতে সুনির্দিষ্ট তথ্যের পর্যাপ্ততার ভিন্নতার এই পার্থক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে পাঠকদের কাছে কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলোর অর্থ হয় খুব সুনির্দিষ্ট, আবার কোন কোন সময় এদের অর্থ হয় স্পষ্ট হয়না যতক্ষন না ঘটনাগুলো ঘটে। এরপরও আবার তৃতীয় আরেক রকম এমন কিছু হাদিস আছে যার কিছু কিছু ব্যাপার স্পষ্ট হলেও ঐ ব্যাপারের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কিছু ব্যাপারগুলো অস্পষ্ট থেকে যায়। যেসব হাদিসগুলো এই তৃতীয় প্রকারের মাঝে পড়ে তাতে কিছু নাম বা স্থানের উল্লেখ থাকতে

পারে কিন্তু এই ব্যাপারটি অস্পষ্ট যে কাকে বা কোন জায়গাকে নির্দিষ্ট করে বুঝানো হচ্ছে। যেমন কিছু অস্পষ্ট শব্দ যেমন ‘পূর্বদিক’ বলতে ইরাক হতে জাপান পর্যন্ত যেকোন ভুখন্ডকে বুঝানো হতে পারে এমনকি নতুন ভূমিকেও (আমেরিকা)। তাই যদিও এই ব্যাপারটি সুনির্দিষ্ট যে ‘পূর্বদিক’ বলতে আরবের পূর্বদিকই বুঝানো হচ্ছে, কিন্তু এই ব্যাপারটি সুনির্দিষ্ট নয় পূর্বদিক বলতে ঠিক কোন জায়গার কথা বুঝানো হচ্ছে। এই শ্রেণীর হাদিসগুলোতে কিছু তথ্য থাকে যা আমাদেরকে ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর জন্য প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করে কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন ঐ ভবিষ্যতবাণীর বিশ্লেষন যা হয়ত আলামতের অজ্ঞতা ও সল্পতার কারণে সবার কাছে স্পষ্ট নয় যতক্ষন না ঘটনাটি পরিপূর্ণরূপে সংঘটিত হয়। এই বিভিন্ন ধরনের ভবিষ্যতবাণীর ধারণা নিয়ে চলুন দেখি ও বিশ্লেষন করি রোমের বর্ণনা সম্বলিত শেষ দিবসের হাদিসগুলোতে কি আছে?

শুরুতেই এই ব্যাপারটি স্পষ্ট করা দরকার যে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নামে যেসব হাদিসের প্রচলন আছে তার মাঝে আমরা শুধু সেগুলোকেই গ্রহন করি যেগুলোর বর্ণনা সহীহ। যদি কোন হাদিস সহীহ প্রমানিত না হয় তবে ইসলামে একে দলিল হিসেবে গ্রহন করা যাবেনা আর এও বলা যাবেনা যে এটি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বর্ণনা। তাই রূম ও শেষ দিবস সম্পর্কিত কেবলমাত্র সহীহ বর্ণনা গুলো নিয়েই এখানে আলোচনা করা হবে কারণ সহীহ নয় এমন সব রেওয়ায়াত ইসলামে দলিল হিসেবে ব্যবহার করা যাবেনা এবং বিশ্বাসযোগ্যতার অভাবের কারণে মুমিনদের অবশ্যই এইসব বর্ণনা বর্জন করা জরুরী। ভবিষ্যত ঘটনাবলী সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দেহের উদ্রেকের মূল কারণ হল জাল ও বানানো হাদিসের বিস্তর ছড়াছড়ি যা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নামে চালিয়ে দেয়া হয়। যদি আমরা কোন জাল হাদিস শুনি তবে আমদের অবশ্যই তা বর্ণনা করা এবং মানুষকে এই ধারণা দেয়া হতে বিরত থাকতে হবে যেন মনে হয় তা একটি সহীহ হাদিস। এরূপ করা একটি মারাত্মক ভুল ও পাপ যা করা হতে আমাদের অবশ্যই বিরত হতে হবে।

কে এই কুরআনে বর্ণিত রূম?

যখন কুরআনে ও রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জীবনের সমসাময়িক হাদিসসমূহে রূম (ٱلرُّومُ) এর বর্ণনা দেয়া হয় তখন পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যকে বুঝানো হত যা আমাদের সময়ে বিজিন্টিনিয় সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। এই নাম এই সাম্রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ‘বাইযান্টিওন’ হতে নেয়া যা পরবর্তীতে ‘কনস্টান্টিনোপোল’ হিসেবে পরিচিত হয় এবং আমাদের সময়ে এসে তার নাম হয় ‘ইস্তাম্বুল’। বিযিন্টিনিয়রা তাদের সাম্রাজ্যকে কখনো এই নামে ডাকতনা তারা একে ‘রোমান সাম্রাজ্য’ (Basileia Rōmaiōn) বলে ডাকত।

কারণ তাদের সাম্রাজ্য ছিল রোমান সাম্রাজ্যের ধারাবাহিকতা যার শুরু হয়েছিল ৭৫৩ খ্রীঃপূর্ব ছোট্ট শহর রোম হতে যা ইটালিয়ান উপদ্বীপে অবস্থিত। রোমান সাম্রাজ্য রোম নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ইউরোপের অধিকাংশ বিস্তীর্ণ অঞ্চল, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় প্রসার লাভ করে এবং এর বিশাল আয়তনের কারণে পরিশেষে দুটি পৃথক প্রশাসনিক অঞ্চলে ভাগ হয়ে যায়। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ছিল রোম শহর কেন্দ্রিক যার বেশিরভাগ জনগণই ছিল 'লাটিন' বংশোদ্ভুত এবং পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য যার কেন্দ্র ছিল কনসটান্টিনোপোল এবং যার অধিকাংশ জনগনই ছিল গ্রীক ভাষাভাষী। সেই সময় রোমান সাম্রাজ্য ছিল এক অখন্ড সাম্রাজ্য তবে কেবল প্রশাসনিক সুবিধার জন্য তা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য কালক্রমে ক্ষয় হতে থাকে এবং পরিশেষে এর পতন হয় ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন উত্তরে অবস্থিত জার্মানিক গোত্রসমূহের হাতে তাদের পরাজয় হয় এবং তারা পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য দখল করে নেয়। এর ফলে রোমান সাম্রাজ্য বলতে কেবল পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের অংশই বাকি রইল। তারা নিজেদের রোমান সাম্রাজ্য বলেই পরিচয় দিতে লাগল যদিও রোম শহর এর আর কোন অংশ হিসেবে রইলনা কারণ "রোম" নামটিই ছিল এই সাম্রাজ্যের প্রতীক, কেবল রোম শহর নয়। পরবর্তীতে ইতিহাসবিদগণ একে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বলে অভিহিত করেন যাতে আগের যুগের রোমান সাম্রাজ্যের সাথে এর পার্থক্য নিরুপন করা সহজ হয় যার বিস্তৃতি ছিল লাটিনভাষী পশ্চিমাঞ্চল ও গ্রীকভাষী পূর্বাঞ্চল। ব্যাপারটিকে আরও সহজবোধ্য করার জন্য 'বাইযিনটাইন সাম্রাজ্য' কথাটির প্রচলন হয় যদিও রোমানরা নিজেরা কখনো এই নামটি ব্যাবহার করেনি। ইবনু আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত একটি হাদিস দ্বারা পরিষ্কার বর্ণনা পাওয়া যায় যে আরবীতে রুম বলতে দ্ব্যর্থহীনভাবেই কনস্টান্টিনোপোল ভিত্তিক রোমান সাম্রাজ্যকেই বুঝানো হয়েছে যাকে পশ্চিমা ইতিহাসবিদগণ পূর্ব/বাইযিন্টাইন সাম্রাজ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই হাদিসটিতে রুম এর নেতাকে দেয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর একটি চিঠির বর্ণনা রয়েছে যে যার শুরুটা হয় এভাবেঃ

إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ

"রোমের নেতা হেরাক্লিয়াসের প্রতি" (তিরমিযিঃ২৭১৭)

এই চিঠির ভাষ্য হতেই বুঝা যায় যে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সময়ে রুম বলতে কনস্টান্টিনোপোল ভিত্তিক বাইযিন্টাইন রোমান সাম্রাজ্যকেই বুঝানো হত যার নেতা ছিল হেরাক্লিয়াস। ইতিহাস মতে হেরাক্লিয়াস (ফ্লাভিয়াস হেরাক্লিয়াস অগাস্টাস) ৬১০-৬৪১ খ্রীঃ পর্যন্ত রোমের শাষক ছিল যার পরিসর ছিল রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জীবনকাল সময়ের সমসাময়িক এবং এই কারণে আমরা এই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারি যে রোম

বলতে নির্দিষ্ট করে কনস্টান্টিনোপোল ভিত্তিক বাইযিন্টাইন রোমান সাম্রাজ্যকেই বুঝানো হচ্ছে। এই ব্যাপারে আরো একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার তা হল খোদ রোম শহর সবসময় বাইযিন্টাইন সাম্রাজ্যের অধীনে ছিলনা, কিন্তু তথাপি আরবগণ সর্বদাই এই সাম্রাজ্যকে রোম বলে অভিহিত করে গেছে (যদিও খোদ রোম শহরকেই বাইযিন্টিনিয়রা বিভিন্ন সময়ে কয়েকবার পুনঃর্দখল করেছে এবং বিভিন্ন সময়ে শাষন করেছে) এবং তাই রুম বলতে ইটালির রোম শহরকে বুঝানো হয়নি বরং কন্সন্টান্টিনোপোল ভিত্তিক বাইযিন্টাইন রোমান সাম্রাজ্যকেই বুঝানো হয়েছে যারা জার্মানিকদের হাতে এই শহর এর পতনের পর অবশ্যম্ভাবীরূপে ‘রোমান সাম্রাজ্য’ নামটির ‘উত্তরাধিকারী’ হয়। তাই রোমানদের হাতে যত জায়গা ছিল তার পুরো অংশকেই মুসলিমরা রোম বলে অভিহিত করেন। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল রোড আইল্যান্ড যা ভুমধ্যসাগরে অবস্থিত এবং যার সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবীদের নিকট হতে একটি হাদিসে বর্ণিত আছেঃ

كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِرُودِسَ مِنْ أَرْضِ الرُّومِ

“আমরা ফযল বিন ‘উবাইদের সাথে ছিলাম রোড আইল্যান্ডে যা রোমে অবস্থিত” [আবু দাউদঃ৩২১৯]

রোড আইল্যান্ড আমাদের সময়ে গ্রীসে অবস্থিত হলেও ঐ সময়ে তা বাইযিন্টাইন সাম্রাজ্যের অংশ ছিল এবং সেই কারণে একে রোমের অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বাইযিন্টাইন সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে যত ভুমি ছিল তার সমস্ত অংশকেই মুসলিমগণ রোমের অংশ হিসেবে গণ্য করতেন। অনুরূপভাবে যদি এই জায়গাগুলো বাইযিন্টাইন সাম্রাজ্যের হাতছাড়া হয়ে যেত তবে তাকে আর রোমের অংশ হিসেবে গণ্য করা হতনা। যখন মুসলিমগণ বাইযিন্টাইন সাম্রাজ্যের কিছু অংশ দখল করে নেন তখন হতে এইগুলোকে আর রোমের অংশ হিসেবে গণ্য করা হতনা কেবলমাত্র যেসব জায়গা বিযিন্টিনিয়দের আওতায় থাকত তাদেরকেই রুম বলা হত। প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ ‘রুম’ বলতে যা বুঝতেন তার ধারণাকে একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখায় বন্দী করাটা যথার্থ নয় কারণ এর দ্বারা রোম শহরকেও বুঝায়না যার নামে এই সাম্রাজ্যের নামকরণ করা হয়েছে, আর না এর দ্বারা কোন সর্বকালীন প্রযোজ্য সুনির্দিষ্ট কোন ভৌগলিক সীমারেখাকেও বুঝায়। বরং যদি কোন এলাকা রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে থাকে তবে যতদিন পর্যন্ত তা এই সাম্রাজ্যের অধীনে থাকত ততদিন পর্যন্ত মুসলিমরা একে রুম বলে অভিহিত করতেন। যদি তা রোমানদের হাত হতে চলে যেত তবে তাকে আর রুম বলা হতনা। তাই রুমের অস্তিত্ব বুঝতে হলে বাইযিন্টিনিয় সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ভূমির নিয়ন্ত্রন সম্পর্কে বুঝতে হবে। এই কারণে কোন ভুখন্ড রুমের অধীনস্থ তা একটি রাজনৈতিক বিষয়। এর দ্বারা এমন সব

এলাকা বা ভুখন্ডকে বুঝাত যা রোমান সাম্রাজ্য দ্বারা শাষিত এবং যার উপর তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় ছিল।

তাই যা আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে তা হল যখন আল্লাহ কুরআনে রুম সম্পর্কে বলেন তখন ঐ নির্দিষ্ট সময়ে (৬১৫ খ্রীঃ) রোমান সাম্রাজ্যকে বুঝানো হচ্ছে। সুরা রুম-এ রোমান বলতে নাযিলের সময়কার বাইযিন্টিনিয়দের বুঝানো হচ্ছে। রুম বলতে কোন এলাকাসমূহকে বুঝানো হচ্ছে তা বুঝার জন্য যখনি রুম কথাটির উল্লেখ করা হবে তখনি চিন্তা করতে হবে কোন ভূখন্ডসমূহ ঐ সময়ে বাইযিন্টিনিয় সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে ছিল। উদাহরণস্বরুপ ৬১৫ খ্রীঃ এ রোডস দ্বীপপুঞ্জ রুম-এর অংশ ছিল কিন্তু ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাম্রাজ্য ও জাতি একে শাষন করেছে তাই এর শ্রেণিবিভাগ নির্ভর করবে কে এর নিয়ন্ত্রণ করছে। রোডস এর একটি রাজনৈতিক অবস্থার একটি টাইমলাইন নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

১৬ শতাব্দী খ্রীঃপূঃ – মিনোয়া

১৫ শতাব্দী খ্রীঃপূঃ – মাইসিনি

৮ শতাব্দী খ্রীঃপূঃ – ডোরীয়ান

৪৯০ খ্রীঃপূঃ – পারস্য সাম্রাজ্য

৪৭৮ খ্রীঃপূঃ – আথেনিয়ান লীগ

৪০৮ খ্রীঃপূঃ – স্বাধীন রোডস

৩৫৭ খ্রীঃপূঃ – কারিয়া

৩৪০ খ্রীঃপূঃ - পারস্য সাম্রাজ্য

৩৩২ খ্রীঃপূঃ – মেসিডোনিয়ান রাজতন্ত্র

৩২৩ খ্রীঃপূঃ – স্বাধীন রোডস

১৬৪ খ্রীঃ – রোমান সাম্রাজ্য

৩৯৫ খ্রীঃ – পূর্ব রোমান/বাইযিন্টিনিয় সাম্রাজ্য

১৩০৯ খ্রীঃ – নাইটস হসপিটালার

১৫২২ খ্রীঃ – ওসমানী সাম্রাজ্য

১৯১২ খ্রীঃ – ইটালি

১৯৪৩ খ্রীঃ – জার্মানী

১৯৪৭ খ্রীঃ – গ্রীস

টাইমলাইনে দেখা যাচ্ছে ১৬৪ খ্রীঃ-এ রোডস রোমান সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে যায় এবং যখন রোমান সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয় তখন তা পূর্ব/বাইযিন্টিনিয় রোমান সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে যায়। এর মানে হল খ্রীঃপূঃ ১৬ শতকে যখন মিনোয়ানদের দ্বারা এর জনবসতির সূচনা হয় তখন হতে ১৬৪ খ্রীঃ-এ রোম সাম্রাজ্যের হাতে আসা পর্যন্ত সময়ে তা কখনোই রুম-এর অংশ হিসেবে পরিচিত ছিলনা। তাই রোম সামাজ্যের হাতে আসার পরই রোডসকে রুম-এর অংশ হিসেবে গণ্য করা শুরু হয়। তাই যখনি রোমানরা এর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে সেই মুহূর্ত হতেই রোডস রুম-এর অংশ হিসেবে আর পরিগণিত হয়না। ওসমানী সাম্রাজ্যের ৪০০ বছরের আধিপত্যের ইতিহাস ছাড়া (এর কারণ পরে বর্ণনা করা হবে) এই কথা পরিষ্কার যে রুম-এর এই দ্বীপ এর উপর আধিপত্য হারাবার পর রোডস আর বাইযিন্টাইন সাম্রাজ্যের অংশ বলে গণ্য হয়নি। আজকের যুগে রোডসকে আমরা গ্রীসের অংশ বলে জানি, অর্থাৎ এটি আবার গ্রীকদের হাতেই চলে যায় যেভাবে তা ছিল ৪৭৮-৪০৮ খ্রীঃপূর্ব কালে। যেভাবে আথেনিয় সময়কালে আমরা রোডসকে রোমান সাম্রাজ্যের অংশ বলে জানতামনা ঠিক সেইভাবে আজও এটি রুম-এর অংশ নয় বরং যখন এটি রোমান সাম্রাজ্য ও তাদের উত্তরসূরীদের হাতে নিয়ন্ত্রিত ছিল ঠিক তখনি একে রুম-এর অংশ হিসেবে পরিগণিত করা হত।

বিভিন্ন সময়ে কোন ভূমিগুলোকে রুম বলে গণ্য করা হত তা বোঝার জন্য এটি বুঝা জরুরী যে একটি ভূমি কেন এবং কিভাবে রুম-এর অংশ হিসেবে গণ্য হয়। একটি ভূমিকে ততক্ষন পর্যন্ত রুম বলে গণ্য করা হবে যতক্ষন এটি রুমের নিয়ন্ত্রণে থাকবে – কথাটি বুঝলেই আমরা নির্ণয় করতে পারি ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে কোন কোন ভূমিসমূহ রুম-এর অংশ ছিল। সেই সাথে এও বুঝা যাবে রুম-এর নিজস্ব সীমানা কতটুকু এবং কোন জায়গা ও অঞ্চলসমূহ এর অধীনে ছিল।

ইবন কাসিরের বর্ণনায় রুম-এর ইতিহাস ও এর মূল এবং এডোমাইটদের সাথে এর সম্পর্ক

ইবন কাসির তাঁর বিখ্যাত তাফসিরের কিতাবে রুম-এর বর্ণনা দিতে গিয়ে কুরআনের সুরা রুম-এ এসে কিছু কথা লিখেছেন। তাঁর আগের ও পরের অন্যান্য লেখকদের মতই তিনি যথার্থভাবেই ব্যাখ্যা করেন যে কুরআন নাযিলের সময়ে রুম বলতে বিযিন্টিনিয়

সাম্রাজ্যকেই বুঝানো হয়েছে। যখন ইবন কাসির এই তাফসির লিখেন (১৩৭০ খ্রীঃ) তখনো কুরআনে উল্লিখিত বিযিন্টিনিয় সাম্রাজ্য বিদ্যমান ছিল কিন্তু তা অনেক দূর্বল দেশ-এ পরিণত হয় এবং এটি কেবল ইউরোপের দক্ষিন-পূর্ব কোনের ছোট একটি অংশ জুড়ে বিদ্যমান ছিল। যদিও কনস্টান্টিনোপোল তখনো বাইযিন্টাইন রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং ঐ সময়ে তা ছিল বিশ্বের সর্বাধিক সুরক্ষিত শহর, ঐ সময়ে তা কেবল তার পূর্বের শান-শওকতের একটি ছায়া হিসেবেই বর্তমান ছিল। কিন্তু এই দূর্বলতা ও আকারের স্বল্পতা স্বত্তেও এই সাম্রাজ্য তার রাজধানীকে বহিঃশত্রুর আক্রমন হতে রক্ষা করতে সক্ষম ছিল এবং ইবন কাসিরের সময়ের আরো এক শতাব্দী পরই কেবল উসমানী সাম্রাজ্য অবশেষে এই শহরের, তাদের শক্ত ঘাঁটি, দখল নিতে সক্ষম হয় যা কার্যকরভাবেই বাইযিন্টিনিয় রোমান সাম্রাজ্যের ইতি টানতে সক্ষম হয়।

ইবন কাসির রোমানদের বর্ণনা দেন সেইসকল উদ্ধৃতি দিয়ে যেগুলোকে আমরা ‘ইসরাইলিয়াত’ বলে অভিহিত করি। এইগুলো ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের হতে নেয়া উদ্ধৃতি যার কোন বর্ণনা কুরআন ও হাদিসে পাওয়া যায়না। ইবন কাসির মনে করেন যেহেতু আল্লাহর দেয়া ওহীতে পূর্বের জাতিসমূহ সম্বন্ধে কোন বর্ণনা নেই তাই আহলুল কিতাবদের (ইহুদী ও খ্রীষ্টান) বর্ণনায় কি আছে তা দেখা যেতে পারে। কোন বিষয়ের সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য এটি কোন গ্রহনযোগ্য পদ্ধতি নয় এবং কেউ যদি শুধুমাত্র বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহই গ্রহন করতে চায় তবে তারা সন্দেহাতীত ভাবেই এই ধরণের বর্ণনাকে বর্জন করতে বাধ্য হবে। বলে রাখা দরকার ইবন কাসির নিজেও তাদের বর্ণনাকে অকাট্য দলীলরূপে গণ্য করেননি বরং তিনি এগুলোর উদ্ধৃতি দিয়েছেন এভাবে যে এসব কথা সত্য হতেও পারে আবার নাও হতে পারে এবং তিনি নিজেও এই ব্যাপারে একমত যে এগুলো ব্যবহার করে কোন বিষয়ের সত্যতা যাচাই সম্ভব নয় কারণ এসব বর্ণনার কোন নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের কোন উপায় নেই। ‘ইসরায়িলিয়ালাইত’ কে তাই কেবল ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের কিছু কাহিনী ও বর্ণনা বলা যেতে পারে যা নিছক সম্ভাব্যতা হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে যেহেতু আলোচ্য ঐ সকল বিষয়াবলী সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট ওহী নেই।

রোমানদের সম্পর্কে ইবন কাসির তাঁর তাফসিরে বলেন, “রোমানদের (রূম) সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে তারা ইসাউ (আল’ইস বিন ইসহাক ﷺ বিন ইব্রাহিম ﷺ এর বংশধর।”

প্রাথমিকভাবে ব্যাপারটি রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসের সাথে পরিচিতদের কাছে একটু অন্যরকম ঠেকতে পারে কারণ পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্য বা বাইযিন্টিনিয় রোমান সাম্রাজ্যের কোনটিই বাইবেল-এর বর্ণিত মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সেমিটিক চরিত্র ইসাউ-এর বংশধর নয়। উভয় সাম্রাজ্যেরই পূর্বপুরুষ সন্দেহাতীতভাবে না সেমিটিক চরিত্র ইসাউ না অন্য কোন সেমিটিক গোষ্ঠী। বরং মূল রোমান সাম্রাজ্যের গোড়া লাটিন (লাটিনি) গোত্রের দিকে ইঙ্গিত করে যারা ইন্দো-ইউরোপিয়ান (লাটিন) ভাষাভাষী ছিল এবং

সেমিটিকদের সাথে তাদের কোনভাবেই কোন সম্পর্কই ছিলনা। লাটিনরা মধ্য-ইটালিয়ান উপদ্বীপে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র গড়ে তোলে যারা লাটিন যুদ্ধে একে অপরের সাথে যুদ্ধ লিপ্ত ছিল। অবশেষে এদের মাঝে সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রটি নিজেকে সমস্ত লাটিনদের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ঐ শহর-রাষ্ট্রটিকেই আমরা আজ রোম হিসেবে জানি। তাই ইতিহাস দ্বারা এটি সুপ্রমাণিত যে রোম লাটিনদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহলে ইবন কাসির তখন কেন বলেছিলেন যে রোমানরা মধ্যপ্রাচ্যের সেমিটিক ইসাউ-এর বংশধর? এই কথার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় ইহুদি রাবি ও পন্ডিতদের বর্ণনায় যারা রোমানদেরকে এডমাইট-দের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে রোমান সাম্রাজ্য এবং খোদ রোম-কেই ইহুদিরা এডোম (হিব্রু ভাষায় 'লাল') বলে অভিহিত করত যার চল আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। তাহলে এডমাইটরা কারা? প্রকৃতপক্ষে তারা ইসাউ-এর সরাসরি বংশধর ছিল। এদেরকে এদের উপনাম 'এডোম' বলে ডাকা হত।

যে কারণে ইহুদিরা এডোমাইটদের সাথে সম্পৃক্ত করে তা হল এডোমাইটরা বর্তমানকালের জর্ডানের দক্ষিন-পশ্চিম এবং ফিলিস্তিনের দক্ষিন-পূর্ব দিকে বসবাস করত এবং এডোমাইটদের মধ্য হতেই ফিলিস্তিনের একটি শাষক পরিবারের উদ্ভব হয়। এই পরিবারের একজন শাষক ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত তার নাম হল হেরড দ্যা গ্রেট যে নবী ঈসা ﷺ এর সময়ে শাষক ছিল বলে দাবী করা হয়। হেরড ছিল জাতিগতভাবে একজন এডোমাইট এবং রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে রাষ্ট্র পরিচালনা করত যা তখন রোম কেন্দ্রিক ছিল। তাই ইহুদিরা রোমান সাম্রাজ্যকে এডোমাইটদের সাথে সম্পৃক্ত করে থাকে কারণ তারা রোমান বলতে যাদেরকে চিনত তারা ছিল আসলে রোমান সাম্রাজ্যের অধীন ফিলিস্তিনের শাষকগোষ্ঠী। ইহুদিদের দৃষ্টিকোণ হতে এডোমাইটদের রোমান মনে করার এই ব্যাপারটিতে আবারো প্রমান করে যে ইহুদিদের কাছেও রুমের সংজ্ঞা ছিল রাজনৈতিক, জাতিগত নয়। ইহুদিরা রোমানদের এডোমাইট বলে অভিহিত করত কারণ এডোমাইটরা রোমানদের সাথে যোগ দেয় এবং ফিলিস্তিন প্রদেশের গভর্ণরের দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া আরো একটি দৃষ্টিভঙ্গী হতে বলা যায় যে ইহুদিরা এডোমাইটদের রোমান বলে অভিহিত করত যদিও এডোমাইটরা ছিল ইহুদি ধর্মের অনুসারী। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে যদিও এডোমাইটরা রোমের মুর্তিপূজার ধর্ম অনুসরণ করতনা তথাপি তারা ছিল রুম-এর অংশ।

আবার এডোমাইটরাই যে রোমান এই দাবী সম্পর্কে এও মনে রাখা দরকার যে এই দাবী কুরআন ও সুন্নাহ হতে নয় বরং তা ইহুদিদের বক্তব্য হতে নেয়া তাই তা আমাদের কাছে কোন প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবার দাবী রাখেনা যদিও তা ইবন কাসির-এর বক্তব্য। কিন্তু এই যুক্তিটি সর্বজনগৃহীত যে রুম বস্তুত ইটালিয়ান পেনিনসুলায় (উপদ্বীপ) অবস্থিত রোম শহর ছাড়াও যেকোন নৃতাত্বিক জাতিকে বুঝাতে পারে এবং এই ব্যাপারে মুসলিম, ইহুদি এমনকি রোমানরাও একমত।

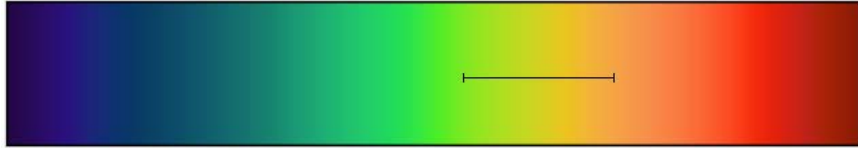
ইবন কাসিরের বর্ণিত রুম ও এডোমাইটদের এই যোগসূত্রের তাই ঐতিহাসিক ভিত্তিও রয়েছে কারণ রোমানরা এডোমাইটদের ভূমি নিজেদের ভূমিতে করায়ত্ব করে যার ফলে কার্যকরভাবেই 'এডোমাইট' নামটিকে তারা বিলুপ্ত করতে সক্ষম হয় যার কারণে এডোমাইটরা রোমান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এবং মধ্যপ্রাচ্য রাজ্যের গভর্ণর নিযুক্ত হয়। এডোমাইটরা রোমান-এ পরিণত হয় এবং সময়ের সাথে সাথে তাদের নিজস্ব সত্ত্বাগত পরিচয় হারিয়ে ফেলে অবশেষে তারা আর এডোমাইট নামে পরিচিত হয়না বরং পরিপূর্ণভাবে রোমানদের সাথে মিশে যায়। তাই ধীরে ধীরে 'এডোমাইট' নামটি বিলুপ্ত হয়ে পড়ে এবং তা 'রোমান' দ্বারা পরিবর্তিত হয়, অনেকটা 'অ্যাযটেক'-দের উত্তরসুরীদের মত, আজকের যুগে অ্যাযটেকরা নিজেদের আর অ্যাযটেক বলেনা বরং তারা নিজেদের 'ম্যাক্সিকান' পরিচয় দেয় কারণ তারা স্প্যানিশদের দ্বারা বিজিত হয়। ঠিক এইভাবেই যারা আগে এডোমাইট নামে পরিচিত ছিল তারা ফিলিস্তিনের রোমান হিসেবে পরিচিত হয়।

ইবন কাসির আরো বলেন, "তারা বনী ইসরায়েল-এর চাচাত ভাই এবং তারা বনী আল-আসফার নামেও পরিচিত।"

এডোমাইটদের সাথে বনী ইসরায়েলের ইহুদিদের খুব নিকট আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল কারণ তারা উভয়েই ইসহাক নবীর উত্তরসূরী ছিল যার কারণে ইবন কাসির তাদেরকে পরষ্পর চাচাত ভাই বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ইহুদিরা বলে থাকে যে এডোমাইটরা তাদের ধর্ম হতে বিমুখ হয়ে যায় এবং আল্লাহর সাথে রোমান দেবতাদেরও পূজা করা শুরু করে। তাই মূর্তিপূজা বিরোধী ইহুদি সম্প্রদায়েরা তাদের মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করে। হিব্রু ভাষায় 'এডোম' নামের অর্থ 'লাল' এবং এটি ইসাউ-এর অন্য আরেকটি নাম বলে খ্যাত কারণ বলা হয়ে থাকে যে তিনি যখন জন্মগ্রহন তখন তিনি রক্তিমবর্ণের ছিলেন। তাই 'এডোমাইট' বলতে শাব্দিক অর্থে বুঝায় 'রক্তিমবর্ণের সন্তানেরা'। এই কথার মাঝে মজার ব্যাপারটি হল আরবরা রোমানদের বোঝাতে যে শব্দটি ব্যাবহার করে তা হল 'হলুদ বর্ণের সন্তানেরা' (বনী আল-আসফার)। প্রাথমিক দৃষ্টিতে মনে হতে পারে লাল ও হলুদ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্ণ এবং তাই তা একই ব্যাক্তি বা জনগোষ্ঠীকে বুঝাতে পারেনা। কিন্তু প্রাচীন হিব্রু ভাষায় গভীর জ্ঞানসম্পন্ন হলে বুঝা যাবে যে তারা খুব সম্ভবত একই রংকেই বুঝায়।

প্রাচীন হিব্রু ভাষায় 'হলুদ' কথাটি বলার কোন উপায় ছিলনা কারণ 'হলুদ' শব্দটির কোন পরিভাষা ছিলনা। প্রাচীন হিব্রু ভাষায় হলুদ বুঝানোর জন্য যে শব্দটি ব্যাবহৃত হত তা হল 'ইয়ারুক' যার প্রকৃত অর্থ ছিল 'সবুজ' কিন্তু মাঝে মাঝে তা স্বর্ণের রংকে বোঝাতেও ব্যাবহৃত হত যাকে আমরা হলুদ রং-এর সাথে সাদৃশ্য করে থাকি। বাস্তবতা হল হলুদ নামের কোন রং হিব্রু ভাষায় ছিলনা তাই হলুদ-কে প্রকাশ করার মত কোন শব্দও ছিলনা। বরং একজন হিব্রুভাষী হলুদের শেডকে দেখে তার কাছাকাছি কোন

রংয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করার চেষ্টা করত। এইক্ষেত্রে তা যদি সবুজাভ-হলুদ হয় তবে তাকে তারা সবুজ বলত আর যদি তা রক্তিম-হলুদাভ হত তবে তাকে তারা লাল বলে অভিহিত করত। এর মানে হল এক নবজাতকের ক্ষেত্রে 'এডোম' শব্দটি ব্যাবহার করলে বুঝতে হবে রক্তিম বর্ণের কাউকে বুঝাচ্ছে যাকে আমরা ইংরেজিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হলুদ রংয়ের সাথে মিলাতে পারি, বিশেষ করে জন্ডিসযুক্ত বাচ্চারা প্রায় দেখতে লালচে দেখায় (জন্ডিস শব্দটিও ফ্রেঞ্চ শব্দ Jaune হতে এসেছে যার অর্থ হলুদ)। তাই খুব সম্ভব ইহুদিরা যখন ইসাউ-কে লাল বা রক্তিম বর্ণের বলে অভিহিত করত তখন হতে পারে তারা গাঢ় লালকে নয় বরং রক্তিম হলুদাভ আভাকেই বুঝাত।



রং-এর বর্ণচ্ছটায় হলুদ, লাল ও সবুজের রূপান্তরের ছবি

হাদিসে বনী আল আসফার সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে যার দ্বারা একটি নৃতাত্বিকগোষ্ঠিকেই বুঝানো হত যারা ছিল রোমানদের মিত্র এবং রোমানদের অধীনস্থ ছিল। এর একটি উদাহরণ হল সহীহ বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদিসঃ

إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ

'এমনকি বনী আসফার-এর রাজাও (রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস) তাকে ভয় পায়'

তাই হতে পারে যেই রোমানদের আরবীতে 'হলুদের সন্তান' বলা হচ্ছে তাদেরকেই হিব্রুতে 'লাল-এর সন্তান' বলে অভিহিত করা হচ্ছে। আর যেহেতু পরিষ্কার বর্ণনা এবং বেশি সম্ভাবনা মতে এই দুটি নাম দ্বারাই রোমানদের বোঝানো হচ্ছে তাই এমন ধারণা করা কঠিন যে এই শব্দগুলো দ্বারা রোমান ছাড়া অন্য কাউকে বোঝানো হতে পারে। বনী আল-আসফার এবং এডোমাইটরা খুব সম্ভব এক এবং একই, উভয়েটি দ্বারাই ইসাউ-এর সন্তানদের বুঝানো হচ্ছে যারা পরবর্তীতে রোমান নাগরিকে পরিণত হয়। এর দ্বারাই প্রতীয়মান হয় কেন ইবন কাসির বনী আসফার-কে রোমানদের অংশ বলে অভিহিত করেছেন এবং সেই সাথে এও বলেছেন যে তারা ইহুদিদের চাচাত ভাই। এই ধরণের বর্ণনা এডোমাইট ছাড়া ইতিহাসের অন্য কোন জাতির সাথে মিলেনা।

ইবন কাসির রোমের বর্ণনা দিতে গিয়ে আরো বলেন যে তারাই সেই জাতি যারা পরবর্তীতে দামাস্কাসে জুপিটার-এর মন্দির নির্মাণ করে এবং কালক্রমে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহন করে এবং কনস্টান্টিনোপোলে নিজেদের ভিত গড়ে। এই কথা উল্লেখোত্তর আমরা

পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই যে তিনি রুম-কে রোমান সাম্রাজ্যের সাথেই মিলিয়েছেন যা রোম শহরে স্থাপিত হয় এবং তিনি পূর্ব ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের সাথে কোন তফাত করেননি বরং তিনি উভয়কেই রুম বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইতিহাস বলে যে আবশ্যম্ভাবীভাবে রোমানরাই দামাস্কাসে জুপিটার-এর মন্দির নির্মাণ করে এবং আমরা জানি যে তারা পেগান (মূর্তিপূজার) ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহন করে। শুধু তাঁর সময়ের রোমান পূর্ব (বিযিন্টিনিয়) সাম্রাজ্যই নয় বরং পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্যের সাথেও তাঁর এই যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে তিনি একথা স্বীকার করেন যে রুম কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলভিত্তিক এককেন্দ্রিক অপরিবর্তনশীল রাষ্ট্র ছিলনা। বরং তিনি স্বীকার করেন যে সময়ের সাথে সাথে ব্যাপকভাবে রুম-এর সংজ্ঞারও পরিবর্তন হতে থাকে। এর মাঝে দুইটি পরিবর্তন খুবই লক্ষনীয় – প্রথমত রুম আগে পেগান (মূর্তিপূজার) ধর্ম ছিল এবং অনেক দেবদেবীর পূজা করত কিন্তু পরবর্তীতে তারা খ্রীষ্টান ধর্মকে নিজেদের ধর্মরূপে গ্রহন করে। অর্থাৎ রুমকে কোন নির্দিষ্ট ধর্মের সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা যায়না বরং এই সাম্রাজ্য খ্রীষ্টান হবার পরও রুম হিসেবেই অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। এর মানে বুঝা যায় যে রুমকে খ্রীষ্টান হতে হবে এমন কোন কথা নেই (এমনকি অন্য কোন ধর্মের হতে হবে তাও নয়) কারণ যখন তারা যখন পেগান (মূর্তিপূজার) ধর্মাবলম্বী ছিল তখনও তারা রুম হিসেবেই পরিচিত ছিল। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল রুম তার অবস্থান পরিবর্তন করেছে কিন্তু এরপরেও রুম নামেই পরিচিত হয়ে আসছে। এর ভিত্তি রোম শহর হতে পরিবর্তিত হয়ে কনস্টান্টিনোপোল-এ স্থানান্তরিত হয়, তথাপি ইবন কাসির একে রোম বলে অভিহিত করেছেন, এমনকি রোম শহর এই সাম্রাজ্যের হাতছাড়া হবার পরও। ইবন কাসির বর্ণিত রুম-এর বর্ণনা হতে এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে সময়ের সাথে সাথে যেই একমাত্র ব্যাপারটি রুম-কে সংজ্ঞায়িত করতে পারে তা হল এর রাজনৈতিক আনুগত্য ও রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রভাব, চাই এর ধর্ম ও অবস্থান যাই হোক না কেন।

রুম-কে কি দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা যায়?

যেহেতু এটা সর্বজনবিদিত ও সর্বগ্রহনযোগ্য যে সময়ের সাথে সাথে ব্যাপকভাবে রুম এর বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন করেছে, একটি ছোট শহর রোম হতে শহরকেন্দ্রিক নগরী রোম, অতঃপর রোমান রাজ্য, এরপর রোমান সাম্রাজ্য এবং কালক্রমে বাইযিন্টাইন সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। এখন প্রশ্ন হল রোমের সংজ্ঞা কি? এটা বোঝা গেল যে রোম শহরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও যার নামে নামকরণ, এবং খোদ রোম শহর-এর উপর আধিপত্য হারানো সত্ত্বেও এই সাম্রাজ্যকে রোম বলেই অভিহিত করা হয়। তাই এই ব্যাপারটি বোঝা

জরুরী যে রুম-কে কোন ব্যাপারগুলো দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যায় এবং কোন ব্যাপারগুলো রুম-কে সংজ্ঞায়িত করার জন্য অপ্রাসঙ্গিক।

প্রথমেই আমাদের জানামতে যে ব্যাপারগুলো রুম-কে সংজ্ঞায়িত করার ব্যাপারে অপ্রাসঙ্গিক এবং যে কারণে অপ্রাসঙ্গিক তা হলঃ

অবস্থানঃ রুম প্রতিষ্ঠা হয় রোম শহরে এবং আট শতাব্দী বছর পর্যন্ত তা এর রাজধানী ছিল যা এরপর কনস্টান্টিনোপোল-এ স্থানান্তরিত হয় (বর্তমান ইস্তাম্বুল) যা আরো এগারশত বছর পর্যন্ত এর রাজধানী ছিল। মিলান ও র‌্যাভেনা স্বল্প সময়ের জন্য পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। সময়ের সাথে সাথে রোম-এর প্রকৃত আয়তন ও অবস্থান পরিবর্তন হতে থাকে। এর শুরু হয় একটি ছোট রাজ্য হিসেবে যা কেবল রোম শহরকে নিয়ন্ত্রণ করত। এই সাম্রাজ্য এর স্বর্ণালী সময়ে ইউরোপের বেশিরভাগ অংশ, আনাতোলিয়া, ককেশাসের বিরাট এলাকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং মিশর ও উত্তর আফ্রিকার বিশাল অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। রোম শহরের ক্ষমতা রুম-এর কাছে সবসময় ছিল তা নয় এবং ৯ম শতকের প্রারম্ভে যখন বাইযিন্টিনিয়রা রুম এর ক্ষমতায় ছিল তখন তারা রোম শহরের উপর কর্তৃত্ব হারায় যা তারা আজ পর্যন্ত ফিরে পায়নি। বাস্তবিকপক্ষে রুম যে অনেক এলাকার উপর কর্তৃত্ব করেছে, এর প্রতিষ্ঠা যে রোম শহরে হয়েছে এবং অবশেষে কন্সটান্টিনোপোলই কেবল এর একমাত্র শহর হিসেবে টিকে ছিল, এতসব ঘটনার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে রুম কোন নির্দিষ্ট এলাকার মাঝে সীমাবদ্ধ ছিলনা বরং যখনই এর কোন এলাকার উপর কর্তৃত্ব ছিল তাকেই রুম বলে অভিহিত করা হত। কুরআন ও সুন্নাহ এই ব্যাপারটির সত্যতার সাক্ষ্য দেয় যে রুম-এর অবস্থান নির্ণয় করতে এর অধিকৃত ভুমিসমূহের উপরই কেবল পর্যবেক্ষন করতে হবে কোন নির্দিষ্ট এলাকার উপর নয়।

রাষ্ট্রের ধরণঃ রুম এর জীবনকালের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করেছে। এর শুরু হয় এক রাজ্য বা রাজত্ব হিসেবে (৭৫৩ খ্রীঃপূর্ব - ৫০৯ খ্রীঃপূর্ব), এরপর তা পরিণত হয় প্রজাতন্ত্রে (৫০৯ খ্রীঃপূর্ব - ২৭ খ্রীঃপূর্ব), এবং পরিশেষে তা পরিণত হয় সাম্রাজ্যে (২৭ খ্রীঃপূর্ব - ১৪৫৩ খ্রীঃ)। যেহেতু রুম বিভিন্ন রুপে বিরাজমান ছিল তাই রাষ্ট্র হিসেবে রুম-এর নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা ছিলনা, বরং এর গঠন ছিল বৈচিত্র্যময় এবং কুরআন ও সুন্নাহতেও আমাদেরকে বলা হয়নি যে এর কোন নির্দিষ্ট প্রকার অবশ্যই থাকতে হবে।

জাতি বা গোত্রঃ রোম প্রথমদিকে লাটিনি বা লাটিন রাজার দ্বারা শাষিত হয় এবং এর বেশিরভাগ জনগণ ছিল লাটিন তবে এর দ্বিতীয় রাজা ছিল স্যবাইন গোত্রের। রোমের পরিব্যাপ্তির বৃদ্ধির সাথে সাথে তা আশেপাশের অনেক গোত্রকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করতে থাকে যেমন আলবান, স্যবাইন এবং অবশিষ্ট লাটিন গোত্রসমূহ এবং কালক্রমে

ইটালিয়ান উপদ্বীপের সমস্ত গোত্রসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত হয়, দক্ষিনে সিসেল হতে ইটালোয়াইটস, মধ্যউপদ্বীপে স্যামনাইটস ও উমব্রিয়ানস হতে উত্তরের ইট্রুকানস, উমব্রিয়ানস ও কেল্টস। রোমের বৃদ্ধির সাথে সাথে তা ইউরোপের অধিকাংশ এলাকা নিয়ন্ত্রন করা শুরু করে এবং এর শাষকশ্রেণী নিম্নোক্ত গোত্রদ্ভুতঃ

লাটিন, স্যাবাইন, এট্রুস্কান, কেল্ট, বিভিন্ন ইটালিয়ান গোত্রসমূহ, গাউলিশ, স্প্যানিশ, ডাকিয়ান, মোয়েসিয়ান, ইলিরিয়ান, কার্থাগিনিয়ান, সিরিয়ান, মৌরিতানিয়ান, প্যানোনিয়ান এবং দানুবিয়ান।

রোমান রাজ্য, প্রজাতন্ত্র ও সাম্রাজ্যের প্রথমদিককার শাষকেরা উপরোল্লিখিত গোত্রসমূহ হতে আগত এবং এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে রোম কোন গোত্র বা নৃগোষ্ঠীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা ছিলনা। এই কারণে রোমান সাম্রাজ্য কালক্রমে গ্রীক বিযিন্টিনিয়দের হাতে থাকার পরও একে রুম বলেই অভিহিত করা হত কারণ রুম-কে কোন জাতি দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যায়না। এছাড়াও কুরআন ও সুন্নাহর কোথাও আমাদের বলা হয়নি যে রুম কোন নির্দিষ্ট গোত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একমাত্র বনী আল-আসফার ছাড়া, যারা ছিল অন্যতম রোমান গোত্র।

<u>ভাষাঃ</u> রুমের অধিকাংশ সময়ের ইতিহাসে দুইটি প্রধান ভাষা ছিল – লাটিন ও গ্রীক। পশ্চিম সাম্রাজ্যের পতনের পূর্ব পর্যন্ত লাটিন ছিল রুমের ভাষা এরপর পূর্বের বাইযিন্টাইন সাম্রাজ্য রুম-এর কর্তৃত্ব গ্রহন করে এবং এই সাম্রাজ্যের প্রধান ভাষা হয়ে যায় গ্রীক। এই দুইটি অফিসিয়াল ভাষা ছাড়াও আরো অনেক ভাষাভাষী লোকজন উপর রোমানদের কর্তৃত্ব ছিল কিন্তু যে দুটি ভাষা এই সাম্রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে সেগুলো হল লাটিন ও গ্রীক। যেহেতু রুম-এর অফিসিয়াল ভাষা ছিল লাটিন ও গ্রীক তাই এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে কোন ভাষাই রুম-এর জন্য সুনির্দিষ্ট নয় এমনকি কুরআন ও সুন্নাহতেও আমাদের বলা হয়নি যে রুম-এর কোন সুনির্দিষ্ট ভাষা ছিল যা তারা ব্যাবহার করত।

<u>ধর্মঃ</u> রুম-এর সূচনাপর্বে এটি ছিল একটি রাজ্য যা গ্রীক দেবদেবী-দের পূজা করত যাদের তারা লাটিন নাম দিয়েছিল যা রোমান ধর্ম নামে পরিচিত ছিল। তাই প্রথমদিকে রুম ছিল মূর্তিপূজার সাম্রাজ্য। ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সম্রাট কনস্টান্টিন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহন করেন। যার ফলে এই সাম্রাজ্যের ধর্ম মূর্তিপূজার ধর্ম হতে পরিবর্তিত হয়ে খ্রীষ্টধর্ম হয়ে যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এমনকি রোমান সম্রাটদের মাঝেও খ্রীষ্টধর্মের বিভিন্ন রকম রূপ প্রতিফলিত হয় কেউ ছিল তিনেশ্বরবাদী, কেউ ছিল আর্য (একেশ্বরবাদী) এবং কেউ কেউ ছিল এই দুয়ের মাঝামাঝি এবং এদেরকে বলা হত কিঞ্চিত আর্য। পূর্ব বিযিন্টিনিয় সাম্রাজ্য পরবর্তীতে অর্থডক্স খ্রীষ্টানবাদের অনুসারী হয়ে যায় অন্যদিকে পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্য পোপের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখে যারা ক্যাথলিক বলে

পরিচিত হয়। খ্রীষ্টানদের সাথে সাথে রুম-এর ফিলিস্তিন প্রদেশে অনেক ইহুদিদের বসবাস ছিল এবং রোমান সম্রাট তাদের ধর্মীয় ব্যাপারগুলো নিয়ন্ত্রণ করত এবং ইহুদি ধর্মের প্রতি সহনশীল ছিল। ইতিহাসবেত্তাগণ আরো আবিষ্কার করেন কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত রোমান সৈন্যদের একটি বিরাট অংশ মিথার নামক ধর্মের অনুসারী ছিল যা পারস্য হতে উদ্ভুত হয়। যেহেতু এই সব ধর্মের অস্তিত্বই রোমান সাম্রাজ্যে ছিল এবং রোমের মূল ধর্মও শতাব্দীর সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় এই কথা পরিষ্কার যে কোন নির্দিষ্ট ধর্ম রুম-কে সংজ্ঞায়িত করেনা, বরং রুম-এর পরিচিতির ব্যাপারে ধর্ম আগেও কোন ব্যাপার ছিলনা এখনো কোন ব্যাপার নয়।

তাই রুম যদি অবস্থান, দেশ-এর ধরন নৃগোষ্ঠী, ভাষা, বা ধর্ম দ্বারা সংজ্ঞায়িত না হয় তবে কি ছিল সেই ব্যাপারটি যা শতাব্দীর পর শতাব্দী রুম-কে সংজ্ঞায়িত করেছে? এর উত্তর রয়েছে ঐখানে যার ব্যাপারে পূর্বেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে রুম ছিল একটি রাজনৈতিক দেশ এবং রাজনৈতিক সম্পর্কই ছাড়া এর আর কোন পরিচয় ছিলনা। এমনকি যখন রোমান সাম্রাজ্য দুইভাগ হয় এবং পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয় তখনো তা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য রুপে চলতে থাকে যা রুম-এর রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় এবং পরিণত হয় এর রাজধানী ও রাজনৈতিক শক্তির উৎস হিসেবে। উপরে বর্ণিত প্রতিটি সংজ্ঞা কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রুম-এর কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক কিন্তু এগুলো রুম-কে সংজ্ঞায়িত করেনা তাই আমাদের সময়ে রুম-কে সংজ্ঞায়িত করার জন্য কেবল এর রাজনৈতিক অস্তিত্বকেই বিবেচনায় আনতে হবে উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো নয়।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনোত্তর এবং শেষ দিবসের সমকালীন রুম-এর পরিচয়

তাই এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে যে যদি প্রাচীনকালে রুম-কে বিভিন্ন পর্যায়ে রোমান সাম্রাজ্য হিসেবে অভিহিত করা হত তবে আমাদের সময়ে এবং কিয়ামতের আগের সময়ে রুম বলতে কি বুঝতে হবে?

কনস্টান্টিনোপোল ভিত্তিক বাইযান্টাইন রোমান সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ কালক্রমে মুসলিমদের হাতে পতন হয় যখন ১৪৫৩ সালে মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ শতাব্দীর পর শতাব্দী টিকে থাকা এই সাম্রাজ্যকে পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেন। যদি শেষ দিবসের হাদিসের ভবিষ্যৎবাণীতে রুম-এর উল্লেখ না থাকত তবে বলা যেত যে ৮৫৭ হিজরীর

শেষে (১৪৫৩ খ্রীঃ) কনস্টান্টিনোপোলের পতনের সাথে সাথে কার্যকরভাবে রুম-এর পতন হয়। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীতে রুম-এর কথা বর্ণনা করেছেন যার অর্থ হল প্রকৃতপক্ষে তা কখনোই বিলুপ্ত হয়নি এবং সন্দেহাতীতভাবে রুম শেষ দিবসের আগেও বিদ্যমান থাকবে কিন্তু এক নতুন পরিচয়ে। যেভাবে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায় এবং বিযিন্টিনিয় সাম্রাজ্য রুম টাইটেলটির 'উত্তরাধিকারী' হয় ঠিক সেভাবে বিযিন্টিনিয়দের পতনের সাথে সাথে রুম এক নতুন পরিচয় লাভ করে শেষ দিবসের আগ পর্যন্ত টিকে থাকবে। এখন যেহেতু আমরা জেনেছি যে রোম কেন্দ্রিক রোমান সাম্রাজ্য এখন অস্তিত্বহীন এবং রুম পরিচয়ের উত্তরাধিকারী বাইযিন্টিনিয় সাম্রাজ্যও এখন আর নেই তাহলে প্রশ্ন হল – রুম টাইটেলটির উত্তরাধীকারী কে? আজকের যুগের রুম কারা এবং এরা কি সেই রুম হবে যাদের কথা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বর্ণনা করেছেন?

এই সমস্ত প্রশ্নগুলো আমিই প্রথম করছিনা এবং আমি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনাকারী প্রথম ব্যাক্তিও নই। বস্তুত আমি সতর্কতার সাথে এই ধারণাও করতে পারি যে এই লেখাটি যারা পড়ছেন তাদের অনেকেই অতীতে নিজ মনে এই একই প্রশ্নগুলো করেছেন এবং এমনকি অনেকে রুম কারা এই বিষয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতামতও শুনেছেন। আমি এই বিভিন্ন মতামত ও ধারণাগুলো সম্পর্কে অবগত এবং আমি এও জানি যে এই বিষয়ে অনেক মতপার্থক্য বিদ্যমান এবং রুম-এর পরিচয় সম্পর্কে কোন সর্বসম্মত উপসংহারে পৌঁছানো যায়নি। এর কারণ ভবিষ্যৎবাণীগুলোর প্রকৃতি যা আমি আগেই আলোচনা করেছিলাম, কিছু জায়গায় স্পষ্ট আবার কিছু জায়গায় অস্পষ্ট। আমরা জানি যে রুম-এর পরিচয় কোন দল বা এলাকার সাথে সম্পৃক্ত নয় যার কারণে অনেক ক্ল্যাসিক্যাল স্কলাররা মনে করেন যে রুম আগের যুগের সেই রোমান সাম্রাজ্যকেই (যেমন বাইযিন্টিনিয় সাম্রাজ্য) বুঝাবে যার সম্পর্কে তাঁরা তাঁদের সময়ে জানতেন এবং এই উপসংহার হল সবচেয়ে অবধারিত যতক্ষন পর্যন্ত কেউ আশা করবে যে রোমান সাম্রাজ্য ভবিষ্যৎবাণীর সময়কাল অব্দি টিকে থাকবে। কিন্তু যখন রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় তখনি ভবিষ্যৎ রুম-এর পরিচয় হয়ে পড়ে অস্পষ্ট যার কারণে এই বিষয়ে কোন ঐক্যমতে আসা সম্ভব হয়নি এমনকি আগের যুগের আলিমগণের পক্ষেও নয়। এমনকি আমাদের যুগে রুম কে তাও পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। রুম কে এই কথাটির সম্ভাব্য নানাবিধ বিশ্লেষণে যাবার আগে আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিই যে 'রুম' কে হতে পারে এই বিষয়ে আমার নিজের একটি জোরালো ব্যাক্তিগত মতামত রয়েছে এবং অন্যান্যদের মতামত জানার পর আমি আপনাদের ব্যাখ্যা করব কেন আমি এই মতামত পোষন করি এবং আপনারা আমার সাথে একমত কিনা এই সিদ্ধান্তের ভার আমি আপনাদের উপর ছেড়ে দেব। তবে এখানে যা বুঝতে হবে তা হল আমি সন্দেহাতীতভাবে দাবী করছিনা যে আমি সঠিক এবং অন্যরা ভুল কারণ

ভবিষ্যতবাণীগুলোর প্রকৃতিই অস্পষ্ট এবং তাই আমরা কেবল আমাদের বিচার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে মন্তব্য করতে পারি এবং আমাদের এই ব্যাপারে জোরালো দাবী করা উচিত নয় যে আমাদের আমাদের দাবীই সঠিক কারণ আরো অনেক ঘটনা ঘটতে বাকি এবং ভবিষ্যতে কি হবে তা মন্তব্য করার ব্যাপারে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং এই কারণেই আমি বলব যে আমার একটি নিজস্ব মতামত আছে যা আমি শক্তিশালী দলিল প্রমাণ দিয়ে শক্তভাবে সমর্থিত করে রেখেছি পেশ করার জন্য। কিন্তু আমি কোনভাবেই দাবী করিনা যে আমি যা সমর্থন করি তা-ই সঠিক হবে সন্দেহাতীতভাবে তা-ই ঘটবে। বরং ভবিষ্যতে ঘটিতব্য এই ধরণের বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে আমরা সবসময়ই বলি যে 'আল্লাহই ভাল জানেন'। এবং এই বলে আমি রূম-এর পরিচয় সম্পর্কিত সর্বাধিক প্রচলিত মতামতসমূহ পেশ করছি এবং আমি আমার নিজের মন্তব্য পেশ করব তখনি যখন সব অভিমতগুলো আলোচনা করা শেষ হবে।

আমাদের সময়কালের রূম-এর পরিচয় সম্পর্কিত সর্বাধিক প্রচলিত মতামত

<u>১। বাইযিন্টিনিয় (রোমান) সাম্রাজ্যঃ</u> এটি ছিল মূল এবং সর্বসম্মতভাবে গ্রহনযোগ্য অভিমত এবং যার স্থায়ীত্ব ছিল ৮৫৭ হিজরী (১৪৫৩ খ্রীঃ) পর্যন্ত। এই মতামত এই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে রোমান সাম্রাজ্য সর্বকালেই মুসলিমদের কাছে রূম নামে পরিচিত ছিল। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাগণের কাছে এটি সবসময় রূম হিসেবে পরিচিত ছিল এবং এটিই ছিল একমাত্র সত্তা যাকে মুসলিমগণ রূম বলে অভিহিত করতেন।

<u>কেন এই অভিমতটি ভুল</u> – যদিও এইকথা সত্য যে বাইযিন্টিনিয় সাম্রাজ্য আসলেই রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সময়ে রূম বলেই সুপরিচিত ছিল তবুও এইখানে এই কথা ধর্তব্যে আনা হয়নি যে রূম ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এক নতুন সত্তা রূম নামটির উত্তরাধিকারী হবে ঠিক যেভাবে আসল রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং বাইযিন্টিনিয়রা তাদের টাইটেলটির উত্তরাধিকারী হয়েছিল। যারা এই মতামত পোষন করতেন তাঁদেরকে এর জন্য দোষারোপ করা যাবেনা যে তাঁরা রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হবার ব্যাপারে আগে থেকে জানতেননা কারণ রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হবার ব্যাপারে তাঁদের সময়ে কোন তথ্য ছিলনা। সেই সাথে যদি বিবেচনা করা হয় যে তাঁদের সময়ে রোমান সাম্রাজ্য তখনো বিদ্যমান ছিল তবে এটিই সবচেয়ে নিশ্চিত অভিমত হবার কথা ছিল যে রূম কেয়ামতের আগের দিনগুলোতেও রোমান সাম্রাজ্য রূপেই বলবত থাকবে।

২। ইটালিঃ এই মতামতের ভিত্তি হল এই যে এই দেশেই রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয় এবং এর রাজধানী রোম যার নামে রুম-কে নামকরণ করা হয়েছে। একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল 'রোম' বলতে তাদের আঞ্চলিক রাজনীতির ভাষায় ইটালিয়ান রিপাবলিককে বুঝানো হয় ঠিক যেমন 'ওয়াশিংটন' বলতে আমেরিকার সরকারকে বুঝায় এবং তাই পুরো জাতিকেই বুঝায়। তাই কেউ কেউ দাবী করে থাকেন যে রুম বলতে ইটালীকেই বুঝানো উচিত কারণ আমাদের সময়ে রোম বলতে ইটালীকেই বুঝায়।

কেন এই অভিমতটি দূর্বল – আগেই বলা হয়েছে খোদ রোম শহরটির রুম-কে সংজ্ঞায়িত করার ব্যাপারে কোন ভূমিকা নেই। রোম শহর তাদের অধীনে না থাকার পরও বাইযিন্টাইন সাম্রাজ্য রুম হিসেবে পরিচিত ছিল এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সময়কালে রুম-এর সাথে রোম শহরের খুব সামান্যই সাংস্কৃতিক সামঞ্জস্য ছিল। ইতিহাস বলে যে বাইযিন্টাইনরা রুম টাইটেলটির উত্তরাধিকারী হয় পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের কারণে এবং কোন কালেই তা রোম শহরের দিকে বা ইটালিয়ান উপদ্বীপের দিকে আর ফিরে আসেনি।

৩। রাশিয়াঃ এই মতের ভিত্তি হল যেহেতু বেশিরভাগ রাশিয়ানই অর্থডক্স চার্চ-এর সাথে সম্পৃক্ত যা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের পতন সময়কার সরকারী ধর্ম ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বেশি অর্থডক্স জনসংখ্যা নিয়ে তাই এই রাশিয়া রুম টাইটেলটির সবচেয়ে বেশি দাবীদার। আরো একটি কারণ বর্ণিত হয়েছে যে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর অনেক রাশিয়ানরাই মস্কো-কে 'তৃতীয় রোম' বলে অভিহিত করা শুরু করে এই কথা বিবেচনা করে যে তা রোম ও কনস্টান্টিনোপোল (যাকে 'দ্বিতীয় রোম' বলে অভিহিত করা হয়) শহরদ্বয়ের উত্তরাধিকারী আর তাই যেহেতু কোন কোন রাশিয়ান মস্কোকে তৃতীয় রোম বলে অভিহিত করেছেন তাই এটি একটি প্রমাণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে আমাদের সময়ে রুম-এর অবস্থান হল মস্কোতে।

কেন এই অভিমতটি দূর্বল – রুম-এর সংজ্ঞা কোন কালেই ধর্মীয় সংজ্ঞা ছিলনা। বাস্তবিকপক্ষে রোমান সাম্রাজ্য প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল মূর্তিপূজার অনুসারী এবং গ্রীক ও রোমান দেবতাদের পূজা করত কিন্তু কেউ দাবী করেনি যে রুম বলে পরিচিত হবার জন্য পেগান রোমান ধর্মের অনুসরন করতে হবে। এছাড়াও রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সময়ে রুম-এর ধর্মীয় পরিচয় অর্থডক্স চার্চের সাথে ছিল এমনটি দাবী করা সম্ভব ছিলনা কারণ পশ্চিমা ক্যাথলিক ও পূর্বের অর্থডক্স সম্প্রদায়ের মাঝে দ্বন্দ তখনো পর্যন্ত শুরু হয়নি এবং ১০৫৪ খ্রীঃ এর পূর্বে তা ঘটেওনি। এর অর্থ হল রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশায় রুম তখনো পর্যন্ত রোম-এর পোপ-এর অধীনস্থ ছিল। পূর্ব ও পশ্চিমা চার্চের দ্বন্দের পর কনস্টান্টিনোপোল শহর অর্থডক্স চার্চের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় যা ছিল বাইযন্টিনিয় সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রধর্ম। কিন্তু অর্থডক্স চার্চের কেন্দ্রবিন্দু আজ পর্যন্ত তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে (কনস্টান্টিনোপোল-এর আধুনিক নাম) মস্কোতে নয় রাশিয়ার কোন অংশেও নয়।

আরো একটি ব্যাপার যা বিবেচনা করা দরকার তা হল রাশিয়া নিজে কখনো রোমান সাম্রাজ্যের অংশ ছিলনা উত্তরাধিকার সূত্রেও রাশিয়া রোমান সাম্রাজ্য হতে কিছু পায়নি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে রুম টাইটেলটি কেবলমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যাদের উপর রোমান সাম্রাজ্য কর্তৃত্ব করেছে এবং কেবলমাত্র রুম-এর একই ধর্মের অনুসারী হবার মাধ্যমে নয়।

৪। অর্থডক্স খ্রীষ্টান জাতিঃ এই অভিমতের পেছনেও ৩নং পয়েন্ট-এর যুক্তি পেশ করা হয়েছে যে যারা বাইযিন্টিন রোমানদের ধর্মের অনুসারী তারাই রুম টাইটেলটির উত্তরাধিকারী যার মাঝে পৃথিবীর সকল অর্থডক্স খ্রীষ্টান জাতি শামিল।

কেন এই অভিমতটি দূর্বল – রাশিয়া সম্পর্কিত যুক্তির মতই এই যুক্তিটিও একথার উপর প্রতিষ্ঠিত যে বাইযিন্টিন রোমানদের মত একই ধর্মের অনুসারী হলেই রুম টাইটেলটির উত্তরাধিকারী হওয়া যায়। রাশিয়া সম্পর্কিত যুক্তি যে কারণে দূর্বল এই যুক্তিটিও ঠিক সেই কারণেই দূর্বল। যদি রুম-কে রাষ্ট্রধর্ম দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা যেত তবে পুরো অর্থডক্স খ্রীষ্টান জাতিকেই ঐতিহাসিকভাবে মুসলিমরা রুম বলে আখ্যায়িত করত কিন্তু এরূপ কখনোই হয়নি। রোমান সাম্রাজ্যের বাহিরে অবস্থানরত অর্থডক্স খ্রীষ্টান জাতিকে ঐতিহাসিকভাবে মুসলিমরা কখনোই রুম-এর অংশ হিসেবে গণ্য করেননি এবং এই কারণে এই অভিমতটিও সঠিক নয়।

৫। ইউরোপ/ই,ইউঃ এই অভিমতের পিছনে যুক্তি হল যে সমগ্র ইউরোপ একযোগে রোমান সাম্রাজ্যের ‘সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারী’। এক্ষেত্রে বর্ণিত হয়ে থাকে যে ই,ইউ সংগঠনটি, যাকে ই,ই,সি বলা হত, প্রতিষ্ঠিত হয় রোম শহরে ‘রোম চুক্তি’ মতে যা ছিল আবশ্যিকভাবেই এমটি ‘রোমান’ সংগঠন। আরো বলা হয়ে থাকে যে যেহেতু ইউরোপের জার্মানিক জাতিসমূহ অতীতে পারষ্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে ৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে একটি মৈত্রী গঠন করে যার নাম দেয়া হয় ‘Holy Roman Empire’ (পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য) সেহেতু এই জার্মানিক জনগোষ্ঠী যারা ইউরোপের মূল কেন্দ্রে বসবাস করত, এরাও ইউরোপের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারী। কেউ কেউ আরো দাবী করেন যে ভূমধ্যসাগর আরবদের মাঝে রোমান সমূদ্র (বাহর আর-রুম) নামে পরিচিত ছিল যা দক্ষিণ ইউরোপের সমগ্র সীমানাকে বেষ্টন করে আছে সেহেতু ইউরোপকে রুম-এর অংশ হিসেবে গণ্য করা উচিত।

কেন এই অভিমতটি দূর্বলঃ যদিও একথা সত্য যে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ইউরোপের বেশিরভাগ সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয় বহন করে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে রুম কোন ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্য ছিলনা। প্রকৃতপক্ষে রুম-এর বেশিরভাগ এলাকাই ছিল ইউরোপের বাহিরে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার মাঝে বিস্তৃত। তাই রুম কোন ইউরোপিয়ান সত্তা এই ধরণের যেকোন ধারণাই সম্পূর্ণরূপে ভুল। রুম-এর সংস্কৃতি

আজকের আধুনিক ইউরোপের সংস্কৃতি হতে অনেক ভিন্ন ছিল এবং এই দুই সংস্কৃতির মাঝে খুব কমই মিল ছিল। ইতিহাস হতে জানা যায় যে ইউরোপ কখনো কোনভাবেই রুম টাইটেলটির উত্তরাধিকারী হয়নি এবং ই,ইউ কখনো এমন দাবীও করেনি। রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সময়ে ইউরোপের বেশিরভাগ অংশ রোমান সাম্রাজ্যের অংশ ছিলনা এবং তাই রুম-এর সাথে ইউরোপের খুব যৎসামান্যই সম্পর্ক রয়েছে। মনে হচ্ছে যে এমন কোন ব্যাপার কেবল তাদের মনেরই কাল্পনিক ইচ্ছা যারা পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অধিকৃত এলাকাসমূহের একই সংস্কৃতি অনুসরণের কল্পকাহিনী দিয়ে ইউরোপিয়ান একতা সৃষ্টি করতে চায়। জার্মানিকদের Holy Roman Empire সম্পর্কে বলা যায় যে এটি রোমান সাম্রাজ্যের সমসাময়িক একটি সাম্রাজ্য এবং এটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সত্তা যার রুম-এর সাথে আদৌ কোন সম্পর্ক ছিলনা এবং তাই একে কোনভাবেই রুম-এর উত্তরাধিকারী বলা যাবেনা। তদুপরি Holy Roman Empire এর কোন কিছুই রোমান ছিলনা এতো কেবল জার্মানিকদের 'রোমান' নামটি অধিগ্রহনের একটি প্রচেষ্টামাত্র যার মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবে ক্যাথলিক চার্চের কাছে বৈধতা দিতে চেয়েছিল। বাস্তবিকতা তো ইউরোপিয়ান লেখক ভল্টেয়ার-এর ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে Holy Roman Empire যে 'না ছিল Holy (পবিত্র) না ছিল Roman (রোমান) না ছিল Empire (সাম্রাজ্য)'।

অন্যদিকে ভূমধ্যসাগর-এর নাম 'রোমান সাগর' প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে এই নাম রাসুলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবাদের কেউ ব্যাবহার করেননি বরং এই নাম পরবর্তী সময়ে ব্যাবহার করা হয়েছে। যে কারণে এই সাগরকে রোমান সাগর বলা হয় তা হল তাঁদের সময়ে রুম ছিল ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত তবে তা এই সাগরের অতি অল্প এলাকা জুড়েই বিস্তৃত ছিল। যদি কেউ প্রস্তাব করে যে ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত সকল জায়গাকে রুম-এর অংশ হিসেবে গণ্য করা হবে কারণ তাকে রুম সাগর নামে ডাকা হত তবে এই দাবিটি হবে এরূপ যেন সমগ্র আফ্রিকা, এশিয়া ও অস্ট্রেলেশিয়া ভারতের অংশ কারণ এগুলো সবই ভারত মহাসাগরে অবস্থিত।

<u>৬। যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা জাতিসমূহঃ</u> এই অভিমতটিও আগেরটির মতই একই যেখানে দাবী করা হয়েছে যে 'রোমান সংস্কৃতি' শুধু ইউরোপকেই প্রভাবিত করেনি বরং তা যুক্তরাষ্ট্রকেও প্রভাবিত করেছে কারণ যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় ইউরোপিয়ানদের দ্বারাই এবং এই কারণেই বলা চলে যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ-প্রভাবিত পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহ সামগ্রিকভাবে রোম-এর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারী। যারা এই মতামত পোষন করেন তাঁরা উল্লেখ করে থাকেন যে যুক্তরাষ্ট্র প্রায়শই তাদের সরকারী দালানগুলো রোমান স্টাইলে তৈরী করে থাকে এবং তাদের জাতীয় ও অঙ্গরাজ্যের স্লোগানগুলোর ক্ষেত্রে লাটিন ভাষা ব্যাবহার করে থাকে।

কেন এই অভিমতটি দূর্বল – রুম ছিল মূলঃত প্রাচ্য কেন্দ্রিক পাশ্চাত্য কেন্দ্রিক নয়, যে কারণে এর সংস্কৃতির সাথে পশ্চিমা সংস্কৃতির খুব অল্পই সম্পর্ক ছিল। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতির কিছু অংশ পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্য হতে নেয়া, এর আধুনিক সংস্কৃতির অধিকাংশের সাথেই না পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের কোন সম্পর্ক আছে না পশ্চিমা রোমান সংস্কৃতির। যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো কখনো নিজেদরকে রোম-এর উত্তরাধিকারী বলে দাবী করেনি এবং তারা কোনভাবেই রুম হতে কোন কিছুর উত্তরাধিকারীও হয়নি। লাটিন ভাষা ব্যাবহারের ব্যাপারে বলা যায় যে এটি একেবারেই অর্থহীন কারণ রাষ্ট্রভাষা হিসেবে এবং সর্বাধিক কথ্য ভাষা হিসেবে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সময়ে গ্রীক ভাষা ব্যাবহৃত হত লাটিন নয়।

৭। খ্রীষ্টানজগতঃ এই অভিমত মতে যেহেতু খ্রীষ্টানধর্ম রুম-এর ধর্ম ছিল তাই খ্রীষ্টানজগত ও খ্রীষ্টানজাতি সামগ্রিকভাবেই আমাদের সময়ে রুম-এর উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য হবে।

কেন এই অভিমতটি দূর্বলঃ আগেই এই ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে রুম কখনোই ধর্ম দ্বারা সংজ্ঞায়িত নয় বরং তার সংজ্ঞা হল এমন এক সত্তা যা রোমান সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের উত্তরাধিকারীত্তের উপর নির্ভরশীল। রাসুলুল্লাহ যেসব খ্রীষ্টানদের সাথে লেনদেন বা কথাবার্তা বলেছেন তাদেরকে কখনোই রোমান বলে আখ্যায়িত করেননি এমনকি খ্রীষ্টান ধর্মের সাথে রোমানদের সম্পর্ক আছে এমন কোন ইঙ্গিতও তিনি দেননি। তাই খ্রীষ্টানদের সাথে রুম-এর কোন সম্পর্ক আছে এমন দাবী করা ভুল হবে। যদি আমরা দাবী করি যে রোমান বলতেই খ্রীষ্টান বুঝানো হবে তবে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবী সুহাইব আর রুমী (সুহাইব রোমান) অবশ্যই নিজেকে রোমান বলে পরিচয় দিতেননা কারণ এর অর্থ দাঁড়াতো যে তিনি একজন মুসলিম নন বরং একজন খ্রীষ্টান। তাঁর নামের সাথে রুমী লাগানোর অর্থ হল তিনি রোমান সাম্রাজ্যের অধিকৃত ভূমি হতে এসেছেন তাই তিনি রোমান এমনকি তাদের ধর্ম ত্যাগ করার পরও।

ক্রুসেডের সময় যখন খ্রীষ্টানরা ফিলিস্তিন এবং এর আশপাশের এলাকা দখল করে তখনো রোমান সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল এবং ইউরোপিয়ান ক্রুসেডাররা সত্যিকার অর্থে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ছিল এবং রোমান কনস্টান্টিনোপোল আক্রমণ করেছিল। এতে করে বুঝা যায় যে ইউরোপিয়ান খ্রীষ্টানরা প্রকৃতপক্ষে অনেক সময়ে রোমানদের শত্রু ছিল এবং তাদের সাথে সাদৃশ্য অনেক কমই ছিল এবং তারা নিজেদেরকে রোমান দাবীও করতনা যদিও তারা একই ধর্মের অনুসারী ছিল। এছাড়াও মুসলিমরা কখনোই খ্রীষ্টান ক্রুসেডারদের রোমান বলেও আখ্যায়িত করেননি। বরং তাঁরা ক্রুসেডারদের ফারাঞ্জ (ফ্রাঙ্ক) বলে অভিহিত করতেন। এর দ্বারা আবারো দেখা যায় যে রুম কেবল রোমান সাম্রাজ্যের সাথেই সম্পৃক্ত ছিল এবং সামগ্রিক খ্রীষ্টান ধর্মের সাথে নয়।

৮। রোমানিয়াঃ এই অভিমতে দাবী করা হয় যেহেতু রোমানিয়া নামটি 'রোম' হতে উদ্ভুত তাই এই নামের কারণে তারা রুম বলে পরিচিত হবার যোগ্যতা রাখে, বিশেষ করে যেহেতু বাইযিন্টিনিয় সাম্রাজ্যকে কথ্য ভাষায় রোমানিয়া বলে ডাকা হত।

কেন এই অভিমতটি দূর্বলঃ কেবল রোম নামটি থাকলেই একটি জাতি রুম টাইটেলটির সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হতে পারে এমন কোন দলিল প্রমাণ পাওয়া যায়না যাতে বলা চলে। যদি তাই হত তবে যেকোন দেশ তাদের নিজেদের নাম পরিবর্তন করে রোম রাখত এবং নিজেদেরকে রুম বলে দাবী করত। কিন্তু এটা কোনভাবেই রুম-এর উত্তরাধিকারের পদ্ধতি নয় যা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে।

উল্লিখিত আটটি মতামতই আমাদের সময়ে রুম-এর পরিচয় নির্ণয়ের ব্যাপারে সর্বাধিক প্রচলিত এবং এর পিছনে বিভিন্ন যুক্তি পেশ করা হয় কেন এইগুলো রুম বলে পরিচিত হবার দাবী রাখে। একয়টি ছাড়াও আরও মতামত রয়েছে যেগুলো গোড়াতেই দূর্বল এবং হালকা, যার কোন দলিল নেই অথবা এগুলোর আলোচনা খুব কমই হয়ে থাকে এবং তাই বেশিরভাগের কাছেই অজানা। এমনকি রুম কে এই সম্পর্কে এমন কিছু মতামতও প্রচলিত আছে যা অযৌক্তিক ষড়যন্ত্রমূলক মতামত বলে মনে হতে পারে এবং বোঝা যায় যে কিছু মানুষের অলীক কল্পনা বাস্তবিকই লাগামহীন এবং বিরক্তিকরভাবে অযৌক্তিক। এর মাত্রা এতই ভয়াবহ যে আমার কাছে মনে হয় রুম সম্পর্কে শুধু এই বলা বাকি আছে যে রুম আসলে ভিনগ্রহ থেকে আসা কোন প্রাণী যারা আমাদের পৃথিবীকে আক্রমণ করবে। এইসব থিওরীর অসারতার কারণে এইগুলো উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই কারণ এইসব মতামতকে আগের যুক্তিগুলো ব্যাবহার করে সহজেই খন্ডন করা যাবে। এর একটি উদাহরণ হল 'রোমা' নামের ইউরোপের কিছু বেদুইন জাতিকে সম্ভাব্য রুম বলে অভিহিত করা হয়েছে এদের নামের কারণে। এই ধরনের যুক্তি সঠিক নয় এগুলো বাতিল, দূর্বল এবং ভিত্তিহীন।

বাইযিন্টিন সাম্রাজ্যের পতনের পর রুম টাইটেলটির উত্তরাধিকারী কে হয়?

এতক্ষনে যে ব্যাপারটি পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন তা হল রুম এর সংজ্ঞা এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সময়ে কোন জাতি রুম টাইটেলটির উত্তরাধিকারী হয় (বাইযিন্টিন সাম্রাজ্য) কারণ তা ছিল রোম শহরে প্রতিষ্ঠিত রোমান সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী এবং তাই আসল রোমান সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারই একটি জাতির রুম হবার

সংজ্ঞা প্রদান করতে পারে। প্রথম উত্তরাধিকারের ঘটনাটি ঘটে যখন রোমান সাম্রাজ্য এর রাজধানী ‘নতুন রোম’ এ স্থানানান্তর করে যা ছিল কনস্টান্টিনোপোল শহর এবং এরই দ্বারা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন ও এর অস্তিত্বের বিলুপ্তির সাথে সাথে বাইযিন্টিন সাম্রাজ্য রুম-এ পরিণত হয় কারণ তা ছিল কারণ তারা ছিল রোম-এর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী এবং রোমান সাম্রাজ্যের অধিকৃত অবশিষ্ট ভূমির ধারক। আবারো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি কোন জাতিকে রুম বলে ডাকার জন্য তাদের খ্রীষ্টান হবার প্রয়োজন নেই যার প্রমাণ হল রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবী সুহাইব (রাঃ) যাকে মুসলিম হওয়া স্বত্তেও রুমী ডাকা হত। যদি রুম নামটি দ্বারা খ্রীষ্টান হওয়া বুঝাত তবে রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনোই তাঁকে এই নামে ডাকার অনুমতি দিতেননা। তাই রুম-এর সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় রাজনৈতিক উত্তরাধিকার এবং অবশিষ্ট রোমান ভূমির দখলদারিত্বের মাধ্যমে এই যুক্তিতে দিয়ে বাইযিন্টিন সাম্রাজ্যের পতনের পর এর উত্তরাধিকারী কে হয় তা খুবই স্পষ্ট। বাইযিন্টিন সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী এবং সেই হিসেবে রুম টাইটেলটির উত্তরাধিকারী ছিল উসমানী সাম্রাজ্য যারা বাইযিন্টিনিয়দের পরাজিত করে এবং তাদের সমস্ত অধিকৃত জায়গাগুলো দখল করে ঠিক যেভাবে বাইযিন্টিনিয়রা রোমান সাম্রাজ্যের সমস্ত জায়গাগুলো দখল করে নেয়।

মুসলিমদের কনস্টান্টিনোপোল বিজয়ের মাধ্যমে এবং বাইযিন্টিনিয়দের অবশিষ্ট স্বল্প ভূমিগুলো দখলের মাধ্যমে উসমানী সাম্রাজ্য সফলভাবে রুম-কে পরাজিত করে এবং বাইযিন্টিন কর্তৃত্বকে নিঃশেষ করে দেয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ সময় হতে রুম-এর নেতৃত্বের যে ধারাবাহিকতা চলে আসছিল তার পরাজয় হয় এবং এরপর তাদের না ছিল কোন জায়গার উপর দখলদারিত্ব না কোন ক্ষমতা। ওসমানীরা রুম-এর অধিকৃত সর্বশেষ ভূমিটিও দখল করে নেয় যেভাবে পূর্বের দশকগুলোতে এর অন্যান্য জায়গাগুলোও দখল হয়ে যায়। রুম-এর পতনের পর মুসলিম শাসক মুহাম্মাদ আল ফাতিহ স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন যে তিনি নিজেকে রোম-এর উত্তরাধীকারী হিসেবে গণ্য করেন এবং নিজেকে রুম-এর কায়সার হিসেবে অভিহিত করেন যা রোমান শাসকেরা নিজেদের জন্য ব্যাবহার করত এবং খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেন যে তাঁর জাতি হল ‘নব্য রোম’ এবং এইভাবেই বিযিন্টিনিয়দের কাছ হতে রুম টাইটেলটির উত্তরাধিকারী হয়। যেই ভূমিটিকে আমরা আনাতোলিয়া বলে অভিহিত করে থাকি (যাকে আমাদের সময়ে তুরস্ক বলা হয়) তাকে এর পরের কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিমরা রুম বলে অভিহিত করতে থাকেন এবং আনাতোলিয়ার কিছু শহর আজ আমাদের সময় পর্যন্ত রুম-এর নাম বহন করে চলেছে। নতুন অধিকৃত কনস্টান্টিনোপোল এবং আনাতোলিয়ার মুসলিমগণ প্রায়ই নিজেদেরকে রুমী বলে অভিহিত করতেন এবং সনামধন্য মুসলিমদের মাঝেও অনেক উদাহরণ রেয়েছে যারা উসমানীদের কাছ হতে এই নামটি গ্রহন করেন। এই পৃথিবীর বুকে একমাত্র উসমানী সাম্রাজ্যই রুম বলে পরিচয় দেবার দাবী রাখে কারণ কেবল তারাই

বাইযিন্টিনিয়দের উপর বিজিত হয় এবং তাদের ভূমি ও ক্ষমতা দখল করে নেয় এবং একমাত্র উসমানী সাম্রাজ্যই কেবল রুম-এর এর উত্তরাধিকারী হবার দাবী করেছিল এবং নিজেদের জন্য রুম টাইটেলটি গ্রহন করেছিল।

মুহাম্মাদ আল ফাতিহ ঘোষনা করেন যে তিনি 'তৃতীয় রোম' প্রতিষ্ঠা করতে চান। প্রথম রোমটি পরিচালিত হয় মূর্তিপূজকদের দ্বারা, দ্বিতীয় রোমটি খ্রীষ্টানদের দ্বারা এবং তৃতীয় রোমটি পরিচালিত হবে মুসলিমদের দ্বারা। এই ব্যাপারটি পরিষ্কার যে তিনি কেবল নিজেকে রুম-এর নেতা হিসেবেই দেখেননি বরং তাঁর আশা ছিল যে রুম একটি খ্রীষ্টান সাম্রাজ্য হতে পরিবর্তিত হয়ে মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হবে। এই ব্যাপারটি তিনি নিজে চাক্ষুস করে যান। ঠিক যেভাবে প্যালাইলোগাস ডাইনেস্টি এর পতন পর্যন্ত খ্রীষ্টান শাষক হিসেবে রুম-এর এর উপর কর্তৃত্ব করে ঠিক সেভাবে উসমানীরা রুম-এর নতুন শাষকে পরিণত হয়।

তাই এই কথাটি একদম পরিষ্কার হয়ে গেল যে বাইযিন্টিনিয় সাম্রাজ্যের পতনের পর উসমানী সাম্রাজ্য রুম-এ পরিণত হয়। রাজধানী ও সমস্ত ভূমি গুলো দখল করার পরিপ্রেক্ষিতে উসমানীরা ছিল বাইযিন্টিনিয়দের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী। উসমানীরা খোলাখুলিভাবেই নিজেদেরকে রুম-এর উত্তরাধিকারী বলে ধারণা করত। তাদের শাষকেরা নিজেদেরকে রুম-এর কায়সার বলে দাবী করত এবং কনস্টান্টিনোপোল ও আনাতোলিয়ার বাসিন্দারা নিজেদেরকে রুমী (রোমান) বলে দাবী করত। এর দ্বারা দেখা যায় যে কেবলমাত্র উসমানীরাই রুম-এর উত্তরাধিকারী ও উত্তরসুরী বলে দাবী করার জন্য সমস্ত শর্তগুলি পূরণ করে যে দাবী উসমানী সাম্রাজ্য করেছিল অন্য কোন জাতি তা করতে পারেনি যা উসমানীরা করেছিল।

কনস্টান্টিনোপোলের পতনের পর কনস্টান্টিনোপোলের অর্থডক্স খ্রীষ্টানদের প্যাট্রিয়াক (সবচেয়ে বড় পাদ্রী) এবং অর্থডক্স খ্রীষ্টান গীর্জার প্রধান ধর্মযাজক গেন্নাডিয়াস খোলাখুলিভাবে মুহাম্মাদ আল ফাতিহ-কে অর্থডক্স খ্রীষ্টান গীর্জার প্রতিনিধি হিসেবে রুম-এর কিসরা বলে স্বীকার করেন এবং এও স্বীকার করেন যে উসমানী সাম্রাজ্যই হল রোম-এর উত্তরাধিকারী। এর মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে উসমানীরাই ছিল নতুন রুম। যেহেতু এমনকি অর্থডক্স চার্চের পাদ্রীও ঘোষনা করেছেন যে উসমানীরাই রুম-এর উত্তরাধিকারী তাই রাশিয়া বা অন্য কোন অর্থডক্স খ্রীষ্টান জাতির রুম হবার বিষয়টির ধারণা অসম্ভব। এর কারণ অর্থডক্সরা নিজেরাই মুহাম্মাদ আল ফাতিহ কে রোম-এর নতুন কায়সার বলে আখ্যায়িত করে এবং তাঁর উত্তরসুরী উসমানীরা এই টাইটেলটির উত্তরাধিকারী হয়। তাই যারা অশুদ্ধভাবে দাবী করে থাকেন যে অর্থডক্স চার্চ রুম টাইটেল-এর উত্তরাধিকারী যারা বাইযিন্টিনিয়দের মত একই ধর্মের অনুসারী তাদের অবশ্যই স্বীকার করা উচিত যে এমনকি অর্থডক্স চার্চ নিজেও ঘোষনা দিয়েছিল যে উসমানীরাই রুম-এর উত্তরাধিকারী অর্থডক্স চার্চ নয় এবং কোন অর্থডক্স জাতিও নয়।

কেন উসমানীরা রুম টাইটেলটির উত্তরাধিকারী হয় এবং অন্য জাতিসমূহ কেন তা হয়নি নীচে তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল।

- একমাত্র উসমানীরাই বাইযিন্টিনিয়দের পরাজিত করে, তাদের ভূমিসমূহ দখল করে, তাদের রাজধানী দখল করে এবং তাদের রাজনৈতিক শাষনের উত্তরাধিকারী হয়।

- উসমানীরা রুম-এর সমস্ত জায়গাগুলো দখল করে এবং মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় যখন যত ভূমি আছে সবগুলো বিজয় করে এবং পূর্ব ইউরোপের প্রায় সমস্ত সাবেক রোমান ভূমিগুলোও তারা দখল করে।

- উসমানীরাই একমাত্র জাতি যারা রুম-এর উত্তরাধিকারী বলে দাবী করেছে এবং খোলাখুলিভাবে এই টাইটেলটি ব্যবহার করেছে।

- মুহাম্মাদ আল ফাতিহ খোলাখুলিভাবেই নিজেকে রোম-এর কায়সার বলে দাবী করেন এবং বাইযিন্টিন সাম্রাজ্যের পতনের পর নিজের জন্য এই টাইটেলটি ব্যাবহার করা আরম্ভ করেন এবং তিনিই একমাত্র ব্যাক্তি যিনি এরুপ করেছেন। এই টাইটেলটি তাঁর পরের উত্তরসূরীরাও গ্রহন করে যান।

- অর্থডক্স প্যাট্রিয়াক গেন্নাডিয়াস নিজেই খোলাখুলিভাবে ঘোষনা করেন যে মুহাম্মাদ আল ফাতিহ ছিলেন রুম-এর নতুন কায়সার এবং উসমানীরা রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী।

এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় যোগ করা যায় তা হল, যদিও জাতিসত্তা ও রক্তসম্পর্ক রুম-কে সংজ্ঞায়িত করার ব্যাপারে কোন ভুমিকা রাখেনা কিন্তু তারপরেও এটি উল্লেখ করার মতই একটি বিষয় যে মুহাম্মাদ আল ফাতিহ এবং আরো বেশ কয়েকজন উসমানী সুলতান ছিলেন বিযিন্টিনিয় রাজবংশের বংশধর। দ্বিতীয় ওসমানী সুলতান ওরহান বিয়ে করেন আসপোর্শা নাম্নী একজন বাইযিন্টিন রাজকুমারীকে যিনি ছিলেন বাইযিন্টিন সাম্রাজ্যের সম্রাট আন্দ্রোনিকোস তৃতীয়-এর কন্যা। সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ ছিলেন ওরহান ও আসপোর্শা-এর বংশধর। এছাড়াও মুহাম্মাদ আল ফাতিহ-এর একজন উত্তরসূরী ছিলেন যিনি বাইযিন্টিন সম্রাটের ভাগিনা/ভাতিজা ছিলেন যা আবারো নির্দেশ করে যে সুলতান ছিলেন বাইযিন্টিন রোমান সম্রাটদের সাথে রক্ত সম্পর্কে সম্পর্কিত।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনার পর এই কথা প্রতীয়মান হয় যে উসমানীরা সত্যিকার অর্থেই রুম-এর রাজনৈতিক উত্তরসূরী এবং রুম টাইটেলটির উত্তরাধিকারী ছিল। এটি এমনই এক বাস্তবতা যা তারা শুধু গ্রহনই করেনি বরং খোলাখুলিভাবে প্রচারও করত। তাই উসমানীরা দাবী করেনি যে তারা রুম-কে ধ্বংস করেছে যার ফলে এর

অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে বরং তারা গর্বভরে একথা প্রচার করত যে তারা কিভাবে রুম-কে জয় করেছে এবং এর টাইটেলটি গ্রহন করেছে। এই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত যে উসমানীরা নিজেদেরকে বাইযিন্টিনিয়দের এবং নতুন রুম-এর উত্তরাধিকারী বলে দাবি করে। উসমানীদের মত অন্য কোন জাতি কোন দিক হতে উত্তরসুরী হবার এই যৌক্তিক দাবী করতে পারেনি তাই উসমানীরাই রুম-এর একমাত্র অধিকারী এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে এর পতনের আগ পর্যন্ত এর অস্তিত্বের পুরো সময়টিই এটি রুম হিসেবে অতিবাহিত করেছে।

সাম্রাজ্যের হাতবদল

সাম্রাজ্যের হাতবদলের কনসেপ্টটি সর্বকালের ইতিহাসেরই একটি আলোচ্য বিষয় ছিল। অনেক সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং অন্যেরা একে জয় করে অথবা কোনভাবে তার নেতৃত্বের পরিবর্তন সাধিত হয়। এই কনসেপ্টকে *translatio imperii* বা সাম্রাজ্যের হস্তান্তর বলা হয়। এই কনসেপ্টটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর দ্বারা নেতৃত্বের পরিবর্তন সত্ত্বেও সাম্রাজ্য কিভাবে টিকে থাকে কেবল তার ধারণাই পাওয়া যায়না বরং এর দ্বারা বুঝা যায় সাম্রাজ্য কিভাবে নেতৃত্ব বিশেষণে সংজ্ঞায়িত হয়ে থাকে যারা এর উপর আধিপত্যের মাধ্যমে কর্তৃত্ব করে থাকে জাতিগত ও ভৌগলিক বিশেষণে নয়।

এই কনসেপ্টটি আমাদের সময়ে এখনও বিরাজমান যদিও সহজ ভাষায় একে বলা হয় ‘Succession of State’ (রাষ্ট্রের উত্তরাধিকার)। ঠিক যেভাবে আগের কালে সাম্রাজ্যের পতন বা তা বিজিত হত ঠিক সেভাবে আমাদের সময়ে কিছুকালে আগেও আমরা দেখেছি রাষ্ট্রের পরিবর্তন এবং পূর্বসূরী রাষ্ট্রের উত্তরাধিকারের ব্যাপারে অনেক তর্ক-বিতর্কও হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয় রাশিয়া নিজেকে এর উত্তরাধিকারী বলে দাবী করে, এই বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে যে সোভিয়েত নেতৃত্ব কার্যকরভাবে রাশিয়ার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে এবং রাশিয়া সোভিয়েত-এর রাজধানীকে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করে। সোভিয়েত-হতে বিচ্ছিন্ন অন্যান্য খন্ড রাষ্ট্রগুলোও উত্তরাধিকারের এই দাবীর বিরোধীতা করেনি। যদিও রাশিয়া সোভিয়েত-ইউনিয়নের চেয়ে আয়তনগত দিক হতে ছোট কিন্তু এই রাষ্ট্রটি কোন বিরোধীতা ছাড়াই দ্ব্যার্থহীনভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরাধিকারী ছিল।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু রাষ্ট্রের পতন হয় কিন্তু তার আর কোন উত্তরাধিকার হয়না। যেমন যুগোস্লাভিয়া অনেকগুলো ছোট ছোট জাতি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং যদিও সার্বিয়া প্রথমদিকে যুগোস্লাভিয়ার উত্তরাধিকারী বলে দাবী করে এই দাবী নিয়ে অনেক

তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং শেষপর্যন্ত সার্বিয়া এই দাবী ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় যুগোস্লাভিয়া অবশেষে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। এই ধরণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উত্তরাধিকার সম্পর্কে জানা জরুরী কারণ উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র নিজেকে যথাযথ উত্তরাধিকারী বলে দাবী করে কিনা তা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। যদি কোন রাষ্ট্র নিজেকে এর উত্তরসূরীর উত্তরাধিকারী বলে দাবী করে না থাকে তবে বলা যায় যে উত্তরাধিকারের ব্যাপারটি আসলে সম্পন্ন হয়নি কারণ উত্তরাধিকার একটি রাজনৈতিক বিষয় এবং পূর্বে বর্ণিত কোন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয়।

তাই এইভাবে এই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে গেল যে উসমানীরা স্বপ্রণোদিতভাবেই নিজেদেরকে বাইযিন্টিনিয় রুম-এর উত্তরাধিকারী বলে দাবী করেছিল ঠিক যেভাবে বাইযিন্টিনিয় রুম ছিল রোমান রুম-এর উত্তরাধিকারী।

বর্তমান সময়ের রুম কে?

যেহেতু উসমানীরা রুম-এর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী ছিল তাহলে আমাদের সময়ের রুম কে? এই উত্তরটি সহজ কারণ শুধু এই কথা জিজ্ঞাসা করলেই উত্তর পাওয়া যাবে – উসমানী সাম্রাজ্যের পতনের পর তাদের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী কে ছিল? উত্তরটি খুব সহজ উসমানী খিলাফতের উত্তরাধিকারী আজ সবার কাছে গণপ্রজাতন্ত্রী তুরস্ক নামে পরিচিত, একমাত্র দেশ যারা উসমানী খিলাফতের উত্তরাধিকারী বলে দাবী করে।

উসমানী খিলাফতের যখন চরম দূর্বল মুহূর্তে এবং ইউরোপিয়ানদের হাতে পতনোম্মুখ অবস্থায় ছিল তখন এর সেনাপতি ছিল মুস্তাফা কামাল (আতাতুর্ক)। সে সাফল্যের সাথে আনাতোলিয়ায় উসমানীদের ভূমিসমূহ এবং এর আশপাশের জায়গাগুলো রক্ষা করে যাতে এগুলো পুরোপুরি হাতছাড়া হয়ে না যায়। এই সময় পরিসরেই তুর্কি জাতীয়তাবাদীদের হাতে উসমানী সাম্রাজ্যের পতন হয় যারা ৬ শতাব্দীর এই সাম্রাজ্যকে উতখ্যাত করে এবং তার জায়গায় গণপ্রজাতন্ত্রী তুরস্ক প্রতিষ্ঠা করে। সুলতানাত-এর বিলুপ্তি ঘটে এবং মুস্তাফা কামাল এই নতুন গণপ্রজাতন্ত্রীর শাষক হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়। জাতি হিসেবে তুরস্ক উসমানী সাম্রাজ্যের রাজধানী ইস্তাম্বুল সহ এর সমস্ত ভূমিসমূহের উত্তরসূরী হিসেবে পরিণত হয়। ইসলামী উসমানী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধবাদী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী এক রাষ্ট্র হওয়া সত্বেও গণপ্রজাতন্ত্রী তুরস্ক উসমানীদের বিভিন্ন সিম্বলগুলোকে অপরিবর্তিত রাখে যেমন এর জাতীয় পতাকা যার রঙ লাল, গায়ে সাদা রংয়ের চাঁদ তারা ছবি। এই চিহ্নের ইতিহাস ছিল উসমানীদেরও আগেকার যখন তা কনস্টান্টিনোপোলের পতাকা হিসেবে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যে ব্যবহৃত হত। রুম বিজয়ের সময় এই চিহ্নটি উসমানীরা গ্রহন করে এবং তখন থেকেই এটি উসমানী সাম্রাজ্যের সাথে

সম্পৃক্ত হয় এবং কালক্রমে এটি গৃহীত হয় এর উত্তরসূরী রাষ্ট্র তুরস্কে। এই ব্যাপারটি প্রনিধানযোগ্য যে তুরস্কের অধিবাসীদের সম্পৃক্ততা মধ্য এশিয়ার তুর্কদের চেয়ে (যাদের নাম হতে তুরস্ক নামটি এসেছে) রোমান/বাইযিন্টিনিয়দের সাথেই বেশি। তুরস্কের অধিবাসীরা আবশ্যম্ভাবীভাবে মোঙ্গল বা তুর্কদের চেয়ে, যাদের নামে তারা পরিচিত, বাইযিন্টিনিয়দের উত্তরসূরী এবং ইউরোপিয়ান, সিরকাসিয়ান ও ককেশিয়ানদের সাথে বেশি সম্পৃক্ত।

উসমানীদের নিকট হতে তুর্কিদের রুম টাইটেলটির উত্তরাধিকারের পর আর কোন জাতিই তুর্কি জাতিকে পুরোপুরি পরাস্ত করতে পারেনি এবং তাদের রাজনৈতিক শক্তি ও ভূমির অধিকারীও হতে পারেনি। তাই আমাদের সময়কার রুম হল গণপ্রজাতন্ত্রী তুরস্ক এবং আমাদের অধিকাংশের কাছেই একমাত্র রুম জাতি (স্বল্প সংখ্যক ব্যাতীত যারা উসমানী খিলাফতের সময়ে জীবিত ছিলেন)। খুব নিকট ভবিষ্যতে তুরস্ক কোন ইউরোপিয়ান জাতির দ্বারা বিজিত হবার মত কোন অবস্থা সৃষ্টি হয়নি কারণ তাদের বেশিরভাগই তুরস্কের প্রতি সদ্ভাবপূর্ণ মনোভাব পোষনকারী এবং কিছু ইউরোপিয়ান জাতি এও চায় যে তুরস্ক যেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্যপদ লাভ করে। বরং এই মুহূর্তে তুরস্কের একমাত্র হুমকি তার দক্ষিন সীমান্তে এবং এই ক্ষেত্রেই শেষ দিবসের আগে তুরস্কের রুম হবার বিষয়টি অধিক যুক্তিসঙ্গত হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের আলোচনার এই পর্যন্ত আমি যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষন করেই কেবল এই কথাই প্রমান করেছি যে বাইযিন্টিনিয় সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে তুরস্ক কিভাবে রুম-এ পরিণত হয়। কিন্তু তুরস্ক কেন রুম তা বুঝার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই রুম সম্পর্কিত শেষ দিবসের হাদিসসমূহে আলোকপাত করা দরকার যাতে আমরা বুঝতে পারি তুরস্ক কিভাবে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই ক্ষেত্রে প্রথম একটি বিভ্রান্তি যা কারো মনে উদয় হতে পারে তা হল ‘তুর্ক’ দের সম্পর্কে নববী হাদিসে অনেক উল্লেখ রয়েছে এবং কেউ কেউ বিভ্রান্তিবশঃত এই হাদিসগুলোকে আধুনিক যুগের তুর্কি প্রজাতন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এই হাদিসগুলো কেন রুম-এর আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত নয় তা বুঝতে হলে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ‘তুর্ক’ বলতে কাদের বুঝিয়েছেন তার ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন অন্যথায় ভুল বুঝাবুঝির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদিসে বর্ণিত তুর্ক কারা?

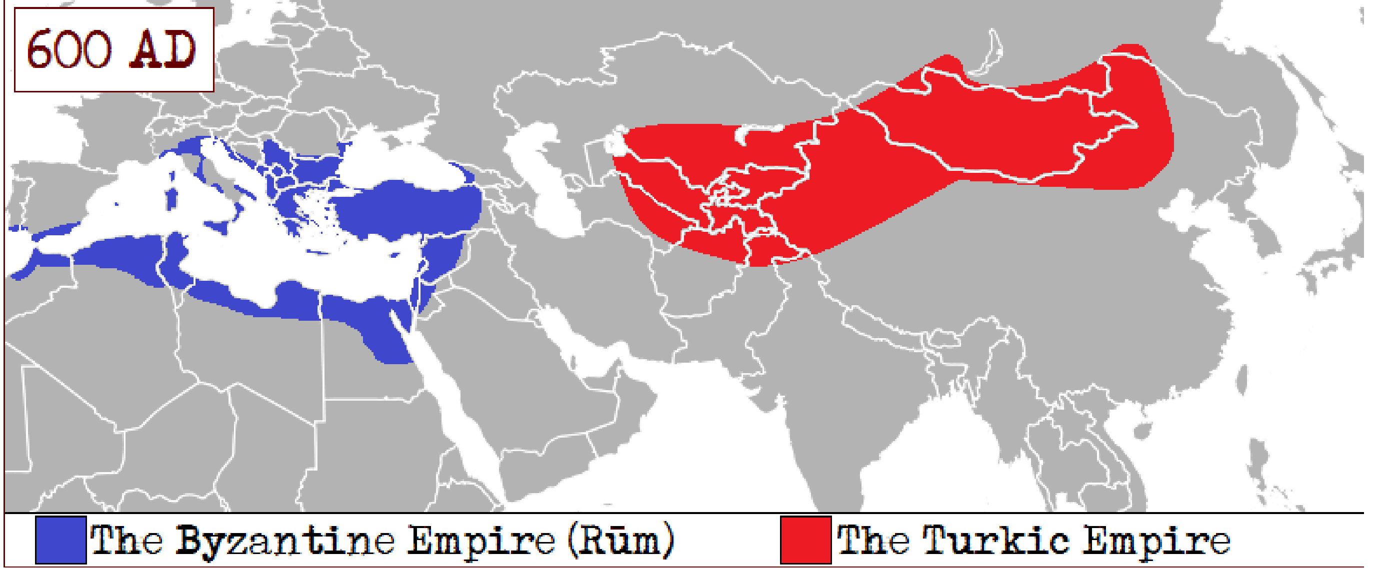
রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

دَعُوا الْحَبَشَةَ مَا وَدَعُوكُمْ وَاتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ

“আবিসিনিয়ানদের ছেড়ে দাও যতক্ষণ তারা তোমাদের ছেড়ে দেয় এবং তুর্কদের ছেড়ে দাও যতক্ষণ তারা তোমাদের ছেড়ে দেয়”। [আবু দাউদঃ ৪৩০২]।

এই হাদিসে বর্ণিত ‘তুর্ক’ শব্দটি একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের লোকদের বঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সময়ে এই সম্প্রদায়ের সাধারণ পরিচিতি আরবদের কাছে জানা ছিল ঠিক যেভাবে জানা ছিল আবিসিনিয়ানদের পরিচিতি। ‘তুর্ক’ সম্প্রদায় পারস্যের পূর্বে এবং চীনের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। একেবারে উত্তর সাইবেরিয়া পর্যন্ত তাদের বিস্তৃতি ছিল এবং মধ্য এশিয়ার বেশিরভাগ জায়গায় তাদের উপস্থিতি বিদ্যমান ছিল। প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ ঐ অঞ্চলকে ‘মা ওয়ারা আন নাহার’ [ما وراء النهر] বলে অভিহিত করতেন যার অর্থ ‘নদীর ওপারে’। এই ক্ষেত্রে নদী বলতে ওক্সাস নদীকে বুঝানো হচ্ছে যা আমাদের সময়ের উজবেকিস্তান ও তুর্কেমিস্তানের সীমানায় অবস্থিত। এই এলাকার বাসিন্দারা তুর্কিক ভাষায় কথা বলত যার সবচেয়ে প্রাচীন নমুনাটি পাওয়া যায় উত্তর মঙ্গোলিয়া ও পূর্ব তুর্কিস্তান অঞ্চলে যা বর্তমান সময়ের চায়নায় অবস্থিত।

প্রথম তুর্কিক সাম্রাজ্যের নাম ছিল গোকতুর্ক সাম্রাজ্য (যা তুর্কিক খাগানাতে নামেও পরিচিত ছিল) যার অধিবাসীগণ প্রাচীন তুর্কিক ভাষায় কথা বলত। রাসুলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم এর জীবদ্দশায়ই এই সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল এবং এই সাম্রাজ্যের অধিবাসীরাই আরবদের কাছে তুর্ক নামে পরিচিত ছিল এবং এই জনপদের অধিবাসীরাই নিজেদেরকে সাধারণভাবে তুর্ক বলে পরিচয় দিত। রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশায় এই সাম্রাজ্য উত্তর পারস্য হতে পূর্ব মঙ্গোলিয়া পর্সন্ত বিস্তৃত ছিল। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে তুর্করা কষ্মিনকালেও আনাতোলিয়া (বর্তমান তুরষ্ক) পৌঁছুতে পারেনি এমনকি এর আশপাশের কোন এলাকায়ও নয়। গোকতুর্ক সাম্রাজ্য পুরো মধ্য এশিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়া ও উত্তর চীন-এর বিশাল অংশ জুড়ে পরিব্যাপ্ত ছিল।



তুর্কিক ও বাইযিন্টিনিয় সাম্রাজ্যের অবস্থানচিত্র – ৬০০ খ্রীঃ

১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গোল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মঙ্গোলরা (যারা তুর্কছিলনা কিন্তু কাছাকাছি কোন ভাষাইয় কথা বলত দ্রুত তুর্কদের পরাজিত করে এবং মুসলিম ভূমিসমূহের দখল নেয়া শুরু করে। যখন মঙ্গোল সাম্রাজ্য পূর্বে মুসলিম ভূমির দিকে বিস্তৃতি লাভ করা শুরু করে ততদিনের তাদের সৈন্যের একটি বড় অংশই ছিল তুর্ক যাদেরকে তারা অল্প কিছুদিন পূর্বে পরাজিত করে এবং মঙ্গোলদের নেতৃত্বাধীন তুর্কদের সাথে মুসলিমদের এই আবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের কথা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ভবিষ্যৎবাণীতে পাওয়া যায়ঃ

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ

“ততদিন পর্যন্ত কেয়ামত হবেনা যতদিন না মুসলিমরা তুর্কদের সাথে যুদ্ধ করবে যাদের চেহারা হবে পেটা ঢালের মত, যারা চুলের তৈরী কাপড় পড়বে এবং তাদের জুতা হবে চুলের তৈরী যা পর তারা হাঁটবে”। [সহীহ মুসলিমঃ ২৯১২]

সন্দেহাতীতভাবে এই হাদিসে মঙ্গোল-তুর্কিক সৈন্যদলের উল্লেখ করা হয়েছে যাদের সাথে মুসলিমরা যুদ্ধ করে ও যাদেরকে মুসলিমরা পরাজিত করে এবং যা আজ পর্যন্ত মুসলিম ভূমিতে সংঘটিত সবচেয়ে বড় আক্রমণ। এটি এক অসাধারণ হাদিস কারণ অতিশয় বিষ্ময়করভাবে এতে মঙ্গোলরা কি রকম জুতা পরবে তার বর্ণনাও রয়েছে এবং এর সংঘটনের সময়কাল রাসুলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যুর ছয় শতাব্দী পর হলেও তিনি এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন যাতে বলা হয়েছে এই সৈন্যদলটি কেমন হবে। ‘Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire’ এ Atwood (২০০৪) উল্লেখ করেছেন যে মঙ্গোলদের এবং সেই সময়ে মঙ্গোলিয় সাম্রাজ্যে বসবাসকারী

অধিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী জুতা ছিল গরুর পশম দিয়ে তৈরি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীরা উল্লেখ করেন যে এতে উটের পশমও ব্যবহৃত হত।

তাই আমরা দেখতে পাই যে রাসুলুল্লাহ ﷺ বর্ণিত তুর্কদের সম্পর্কীয় ভবিষ্যতবাণীতে তুর্ক বলতে মঙ্গোল ও মধ্য এশিয়ার তুর্কদের বুঝানো হয়েছে তাই রূম সম্পর্কিত আলোচনায় তার বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক কারণ গণপ্রজাতন্ত্রী তুরষ্কের সাথে হাদিসে বর্ণিত তুর্কদের কোন সম্পর্ক নেই। যে কারণে তুর্কি জাতি এই নাম গ্রহন করেছে তা হল মঙ্গোলদের আক্রমণ ও আধিপত্য বিস্তারের সাথে সাথে যখন মধ্য এশিয়ার তুর্কিক সংস্কৃতিরও বিস্তার লাভ ঘটে তখন তা একেবারে আনাতোলিয়া পর্যন্ত চলে আসে এবং ধীরে ধীরে এই অঞ্চলের মূল ভাষা হিসেবে পরিণত হয়। তবে একথা আগেই বর্ণিত হয়েছে যে তুরষ্কের পূর্বদিকের কিছু গ্রামে খুবই যতসামান্য ব্যাতীত আনাতোলিয়ার অধিবাসীরা তুর্কদের সাথে রক্ত সম্পর্কে সম্পর্কিত নয়, তাদের সাথে কোনভাবে রাজনৈতিক কোন সম্পর্কও ছিলনা। আজকের যুগের তুর্কির অধিবাসীদের বেশিরভাগই তুর্কদের চেয়ে পূর্ব ইউরোপ, কুর্দ, এবং সিরিয়ানদের সাথে সম্পৃক্ত। নাম একই হবার কারণ কেবলমাত্র কিছু হালকা ভাষাগত সম্পর্ক এমনকি উসমানীদের সময়েও তা খুব হাল্কাভাবেই ব্যাবহৃত হত। ‘তুর্ক’ নামটি ব্যবহৃত হত একটি গ্রামকে উল্লেখ করে যা পূর্ব আনাতোলিয়ায় অবস্থিত ছিল এবং এটি ছিল একটি অবমাননাকর নাম ঠিক ইংরেজিতে যেমনভাবে ‘মঙ্গোল’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক তুরষ্কের শাষক হবার পর তুরষ্ককে তাদের পশ্চিমের ইউরোপ ও দক্ষিণের আরব-দের হতে দূরে নিয়ে যাবার জন্য এই তুর্ক শব্দটি ব্যাবহার করে এবং মধ্য এশিয়ার তুর্কদের সাথে ভাষাগত সম্পর্ক স্থাপনের দোহাই দিয়ে তুর্কিক পরিচয়টির প্রচার প্রসার ঘটাতে থাকে। তাই এই কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার যে হাদিসে বর্ণিত তুর্ক বলতে আসলে মধ্য এশিয়ার তুর্ক জাতিকেই বুঝানো হয়েছে যারা মঙ্গোলদের দ্বারা অধিকৃত হয় এবং পরবর্তীতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাই নামে সাদৃশ্য থাকা স্বত্তেও তুরষ্কের সাথে তুর্কদের কোন সম্পর্ক নেই।

মুসলিমদের পক্ষে কি রূম-এর উত্তরাধিকারী হওয়া সম্ভব?

উসমানীরা রূম টাইটেল-এর উত্তরাধিকারী এই কথা জানার পর কেউ কেউ এই সন্দেহ পোষন করেন যে মুসলিমরা কখনোই রূম হতে পারেনা কারণ রূম হল এমন এক জাতি যারা মুসলিমদের সাথে সবসময়ই যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে। এটি একটি ভুল ধারণা যার কোন ভিত্তি নেই এবং এই ধারণা ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথম কথা হচ্ছে একজন মুসলিম অবশ্যই রুম হতে আসতে পারে যা আমাদের জানা মতে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবা সুহাইব (রাঃ) ছিলেন রুম হতে এবং তাঁকে রুমী বলে ডাকা হত এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনোই এই ব্যাপারে কোন আপত্তি করেননি। যেহেতু রুম পরিষ্কারভাবে রাজনৈতিক সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত তাই ধর্ম যাই হোক না কেন, যদি কেউ রুম-এ বসবাস করে তবে তাকে রুম এর লোক বলে গণ্য করা হবে চাই সে মুসলিম, খ্রীষ্টান, মূর্তিপূজক বা অন্য যে কোন ধর্মেরই হোক না কেন।

এই দাবীর আরো একটি ব্যাপার রয়েছে তা হল এই কথা সঠিক নয় যে মুসলিমরা তাদের সাথে সবসময়ই যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে। বরং এই কথাটি সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে যে কেয়ামতের আগে রুম মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করবে যা হবে উভয়ের মধ্যে কৃত চুক্তি ভঙ্গের ফলশ্রুতি। এর অর্থ হল এমনও সময় আসবে যখন মুসলিমরা রুম-এর সাথে যুদ্ধ করবেনা এবং আমরা জানি যখন কুরআনে রুম-এর কথা উল্লেখ করা হয় তখন মুসলিমরা রুম-এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলনা বরং সেই সময় রুম-এর হাতে পারস্যের পরাজয় দেখে মুসলিমরা উল্লসিত হয়। এরপর মুসলিমরা আবশ্যম্ভাবীভাবেই রুম-এর সাথে যুদ্ধ করেন এবং এই যুদ্ধ বাইযিন্টিন সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত চলতে থাকে। কিন্তু এর দ্বারা বুঝা যায় যে এটি জরুরী নয় যে মুসলিমরা সবসময় রুম-এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে বরং এই ব্যাপারটি সকলেরই জানা যে আগেও এমন সময় গেছে যে দুপক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত ছিলনা এবং ভবিষ্যতেও এরূপ সময় আসবে।

তাই এটিও সম্ভব যে উসমানী সাম্রাজ্য, যারা কিনা বাইযিন্টিনিয়দের উত্তরাধিকারী ছিল, মুসলিম হবার পরও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রুম হিসেবে বিদ্যমান ছিল। একথা সত্য যে উসমানীরা একেবারে পারফেক্ট ছিলনা এবং কেউ কেউ এও দাবী করে থাকেন যে তাদের শেষের দিকের শাষকেরা শরিয়ত সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ না করার কারণে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে পড়ে। কিন্তু এই ব্যাপারটি ছাড়াও কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিমরা রুম টাইটেলটির উত্তরাধিকারী ছিল বিশেষ করে উসমানীরা নিজেদেরকে গর্বভরে রুম-এর উত্তরাধিকারী বলে ঘোষনা দিত।

এরপর গণপ্রজাতন্ত্রী তুরষ্কের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কিত একটি কথা এসে যায়। এটি এমন একটি ব্যাপার যা অনেককেই বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয় কারণ তারা বিশ্বাস করে গণপ্রজাতন্ত্রী তুরষ্ক কোন না কোনভাবে ইসলামিক। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন এমন যে কেউ বুঝতে পারবেন যে তুরষ্ক তার বর্তমান অবস্থানে ইসলাম হতে অনেক অনেক দূরে। সেইসাথে এই মুরতাদ দেশটি প্রতিষ্ঠিত হয় ইতিহাসের অন্যতম ঘৃণিত ব্যক্তি – মুস্তাফা কামাল এর মাধ্যমে যে আতাতুর্ক নামেও পরিচিত।

মুস্তাফা কামাল-এর জন্ম থেসালোনিকি শহরে যা উসমানী সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। তার জন্ম হয় এমন এক সময়ে যখন উসমানী সাম্রাজ্য মারাত্মকভাবে দূর্বল হয়ে গিয়েছিল,

হয়ে পড়ছিল বিচ্ছিন্ন এবং পুরোপুরিভাবে ইউরোপিয়ান শক্তিদের হাতে পতনোম্মুখ অবস্থায় ছিল। সে উসমানী সাম্রাজ্যের হয়ে যুদ্ধ করে এবং একজন সেনানায়ক হিসেবে তার উত্থান হয়। কনস্টান্টিনোপোল-এর পতন এবং ইউরোপিয়ানদের হাতে উসমানীদের আত্মসমর্পণের সময় পর্যন্ত সে সেনাবাহিনীতে ছিল। এই সময়ে সে পরিচিত ছিল একজন সাহসী সমরনায়ক হিসেবে যে কাফের ইউরোপিয়ানদের সাথে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে। কিন্তু তার উদ্দেশ্যের সাথে উসমানীদের উদ্দেশ্যের মিল ছিলনা। বরং সে ছিল একজন ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী যার একমাত্র আশা ছিল আনাতোলিয়ায় একটি তুর্কি বসতি গড়ে তোলা যা পরিচালিত হবে ইসলাম দ্বারা নয় বরং ধর্মনিরপেক্ষ আইন দ্বারা। মুস্তাফা কামালের এই উদ্দেশ্যকে এমিল লেঙ্গিল এভাবে বর্ণনা করেনঃ

"মুস্তাফা কামালের কর্মজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে তার অনেক অনুসারীদের এই ধারণা ছিল যে সে ছিল ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ এবং তারা খ্রীষ্টানদের সাথে যুদ্ধ করছিল। 'গাযী (যোদ্ধা), খ্রীষ্টান বিনাশী' এইভাবেই তারা তাকে আখ্যা দিত। যদি তারা তার আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানত তবে তারা তাকে 'গাযী, ইসলাম বিনাশী' নামে আখ্যায়িত করত" [তুর্কি, ১৪০-১৪১পৃঃ]।

মুস্তাফা কামাল পরবর্তীতে রাজনীতিতে যোগদান করে এবং জাতীয়তাবাদীদের একটি দলের নেতৃত্ব দান করে যারা আনাতোলিয়ান ভূমি কেবল ইউরোপিয়ানদের দ্বারা দখল হয়ে থাকাকেই অপছন্দ করতনা বরং তারা আনাতোলিয়ায় জাতীয়তাবাদীদের পরিকল্পনার বিরোধী উসমানী শাষকদেরও বিরোধিতা করে। অবশেষে উসমানী সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং গণপ্রজাতন্ত্রী তুরষ্ক প্রতিষ্ঠায় মুস্তাফা কামাল জাতীয়তাবাদীদের নেতৃত্ব দেয় যে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় ধর্মনিরপক্ষ আইন দ্বারা। যদিও অনেকে মুস্তাফা কামালের তুর্কি ভাষার অক্ষরগুলোকে আরবী হতে লাটিন ভাষায় রূপান্তরের প্রচেষ্টা এবং আরো ছোট-খাটো বিষয়কে তার কুফরির প্রমাণ হিসেবে পেশ করে থাকেন, প্রকৃতপক্ষে কুফরির সবচেয়ে বড় উদাহরণ নব্য প্রতিষ্ঠিত তুর্কি প্রজাতন্ত্রের জাতীয় 'গঠনতন্ত্রের' মাঝেই নিহিত রয়েছে যা মুস্তাফা কামাল নিজেই বর্ণনা করেছে। নিচে তার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হল যা সে নিজে পরিকল্পনা করেছে এবং ১৯২০ সালে তুর্কির সংবিধানে সংযোজন করেছেঃ

"Hâkimiyet bilâ kaydü sart milletindir"

সার্বভৌমত্ব নিঃশর্তভাবে কেবল জনগণের।

এই কথাটি আল্লাহর এই কথার সাথে সরাসরি বিরোধীঃ

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ

সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহর। [১২:৪০]

তাই এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে তুর্কি প্রজাতন্ত্র কুফর-এর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এর শাষক মুস্তাফা কামাল মুসলিম ছিলনা। এই ব্যাপারে খুব কম লোকই দ্বিমত করে থাকেন কারণ এই লোকের কুফর এত চরম পর্যায়ে ছিল যে এমনকি সবচেয়ে উদারপন্থী মুসলিমও স্বীকার করে থাকেন যে সে ছিল এক মুরতাদ (ইসলাম ধর্মদ্রোহী/ধর্মত্যাগী কাফের)। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তথাকথিত 'ইসলামিক দল'গুলোর উত্থান হয় এবং তারা ক্ষমতায় আসীন হয়। এই দলগুলোকে চরমপন্থী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা 'ইসলামিক' দল বলে গণ্য করা শুরু করে কারণ তারা সরকারী দপ্তরে হিজাব নিষিদ্ধের মত কিছু নগণ্য আইন নিয়ে মতানৈক্য করছিল। কিন্তু এই অতি নগণ্য বিষয়গুলো ব্যাতিরেকে যখন রাষ্ট্র পরিচালনার মত বিষয়গুলো সামনে আসত তখন তাদের সাথে কট্টর ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর কোন পার্থক্য নির্ণয় করা যেতনা। আজ আমাদের সময়ে তুরষ্ক শাষন করছে এইসব ছদ্মবেশধারী ভন্ড ইসলামপন্থীরা, আহমেত দাভুতোগলু এবং রিসেপ তায়েপ এরদোগান, দুজনই সেক্যুলার শাষনের প্রতি ঠিক ততটাই একনিষ্ঠ যতটা মুস্তাফা কামাল নিজে ছিল। প্রকৃতিপক্ষে তারা গর্বের সাথে সেই মন্ত্রের পিছনে দাঁড়ায় যা ছিল মুস্তাফা কামালের নিজের কথা যা সাধারণ জমায়েত হলের উপর হতে সবার সামনে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষনা করা হয়েছিল যার উপর দাঁড়িয়ে তারা বক্তৃতা দেয় – "সার্বভৌমত্ব নিঃশর্তভাবে কেবল জনগণের"। আজকের যুগের তুরষ্কের শাষকেরা যে কড়া সেক্যুলারিস্ট তা তাদের নিজেদের কথাতেই প্রমাণিত হয় –

হুসাইন সেলিক, দেভুতোগলু ও এরদোগান-এর দলেরই একজন মন্ত্রীর মতে "*পশ্চিমা মিডিয়ায় যখন AK পার্টি প্রশাসন, গণপ্রজাতন্ত্রী তুর্কির ক্ষমতাসীন দল, এর নাম আসে দুর্ভাগ্যজনকভাবে অধিকাংশ সময়ে 'ইসলামিক', 'ইসলামিস্ট' 'কিঞ্চিত ইসলামিস্ট', 'ইসলাম-মুখী', 'ইসলাম-ভিত্তিক' অথবা 'ইসলামী এজেন্ডা ভিত্তিক' এবং এই ধরণের ভাষাগুলো ব্যাবহৃত হয়ে থাকে। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যপ্রদানের ব্যাপারগুলো সত্য নয় এবং এগুলো আমাদেরকে আহত করে। AK পার্টি একটি রক্ষনশীল গণতান্ত্রিক দল। AK পার্টির রক্ষনশীলতা নৈতিক ও সামাজিক বিষয়াবলীতে সীমাবদ্ধ*"।

এরদোগান নিজেই বলে, "***আমরা ইসলামিক দল নই***, *আমরা মুসলিম-গণতান্ত্রিক লেবেলটিও অস্বীকার করি*"।

আজকের যুগের তুর্কির শাষকদের অবস্থা মুরতাদ মুস্তাফা কামালের চেয়ে কোন অবস্থায়ই ভিন্ন নয়। তাই তুরষ্ক 'ইসলামিক দেশ' এই মন্তব্য সত্য হতে বহু যোজন দূরে।

বরং এটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র যার আইন কানুনের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই বরং আল্লাহর ওহীর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। তাই যদি তুরষ্ক, আমাদের সময়ের রুম, ঠিক যেমনটি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সময়ের রুম-এর মতই মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, যারা আল্লাহর আইন অনুযায়ী শাষন করে, তবে তা হবে মুসলিম-মুরতাদ যুদ্ধ, মুসলিম-মুসলিম যুদ্ধ নয়। যে বা যারা সেক্যুলার আইনকে সমুন্নত করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যারা আল্লাহর আইন দিয়ে শাষন করে তবে তাদের অবস্থা মুরতাদ শাষকদের চাইতে কোন দিক দিয়ে ভিন্ন নয় এবং তাই যতক্ষন পর্যন্ত তুরষ্ক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের অধীনে থাকবে ততক্ষন পর্যন্ত তারা মোটেও ইসলামের উপর নেই বরং তারা তাদের প্রতিষ্ঠাতার দেয়া উত্তরাধিকার এখনো বয়ে বেড়াচ্ছে যারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করেছিল। তাই তুর্কি জনগোষ্ঠির বেশিরভাগ মুসলিম এই কথা দিয়ে দেশটির নিজের বৈশিষ্ট্যকে বিচার করা হবে ভুল কারণ তা কুফর-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। ঠিক যেমন মোঘল সাম্রাজ্য আওরঙ্গজেবের অধীনে ইসলামী আইন দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল কিন্তু তার বেশিরভাগ জনসংখ্যা ছিল হিন্দু, ঠিক তেমনি আজকের যুগে তুরষ্ক সেক্যুলার আইন দ্বারা পরিচালিত হলেও এর অধিকাংশ জনসংখ্যাই মুসলিম। যারা সেক্যুলারিস্টদের পক্ষে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তারা হল সেক্যুলারিস্ট এবং যারা মুসলিম তারা সেক্যুলারিস্টদের সাথে যোগ দেবেনা বরং তারা তাদের মুমিন ভাইদের সাথে যোগ দেবে। তাই আমাদের সময়ের তুরষ্কের সাথে এরূপ যুদ্ধ কোনভাবেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের যুদ্ধ নয়।

রুম ও মুসলিমদের যুদ্ধের সুনির্দিষ্ট এই ঘটনার ব্যাপারে আরও কিছু ব্যাপার আছে যা ঘটার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের ভবিষ্যতবানী করেছেন। পরের অধ্যায়ে এই ঘটনাগুলোকে আলাদাভাবে দেখানো হবে তবে উপরোক্ত আলোচনা একথা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথেষ্ট যে গণপ্রজাতন্ত্রী তুরষ্কের অধীন রুম-এর শাসন কোনভাবেই ইসলামিক নয় বরং এটি ইসলামবিরোধী এবং খুব সম্ভব মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্ব তুরষ্কই দেবে।

শেষ দিবসের হাদিসে রুম

রাসুলুল্লাহ ﷺ শেষ দিবসের আগে রুম-এর ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করে গেছেন তাই এই সময়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করা মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু যদি আমরা রুমকে সঠিকভাবে সনাক্ত করতে না পারি এবং আমরা যদি রাসুলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم এর হাদিসগুলোকে সঠিকভাবে বুঝতে অসমর্থ হই যা শেষ দিবস-এর

সাথে সম্পর্কিত, তবে আমরা ঐ সময়ের জন্য সঠিক প্রস্তুতি গ্রহন করতে পারবনা। তাই আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে আমাদেরকে যা বলা হয়েছে তা যেন আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারি এবং যেন তা দ্বারা কি বুঝানো হতে পারে তা অনুমান করে বসে না থাকি, হয়তবা এর কারণে আমরা এইসব পূর্বাভাসের উপকারিতা হতে দূরে থেকে যাব।

আল্লাহর রাসুল ﷺ আমাদের জানিয়েছেন যে ইসলামের অনুসারীরা রুম-এর সাথে যুদ্ধ করবে এবং এই যুদ্ধের জায়গা হবে শাম (লেভান্ত) ও আনাতোলিয়ার (তুরস্ক) আশেপাশের কোন জায়গা। এই যুদ্ধ যে শাম-এর আশেপাশে কোথাও হবে তার প্রমান নিম্নোক্ত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

لَاتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ اَوْ بِدَابِقَ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِّنَ الْمَدِيْنَةِ مِّنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَءِذٍ

"ততক্ষন পর্যন্ত শেষ সময় আসবেনা যতক্ষন না রোমানরা আমাক বা দাবিক প্রান্তরে অবতরন করে। তাদের মোকাবেলায় ততকালীন সময়ের পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট সেনারা আসবে মদিনা হতে" [সহীহ মুসলিম-২৮৯৭]।

আল-আ'মাক ও দাবিক উভয়েই শাম-এর উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। দাবিক আলেপ্পো-এর প্রায় ঠিক দক্ষিনে অবস্থিত একটি ছোট শহর এবং বর্তমান তুরস্কের সীমানা হতে খুব কাছে অবস্থিত। আল-আ'মাক হল একটি অঞ্চল যার বেশিরভাগ অংশ তুরস্কের 'হাতায়' প্রদেশে অবস্থিত (যা ভৌগলিকভাবে আশ-শামের অংশ) এবং উত্তর-পূর্বদিকে আলেপ্পোর কাছাকাছি পর্যন্ত বিস্তৃত। এর নাম আ'মাক হবার কারণ হল এটি একটি সমতল ভূমি যা পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত এবং আরবীতে আল-আ'মাক (বহুবচন 'আমক) বলতে পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত এলাকা, যেমন বেসিন বা উপত্যকাকে বুঝায়। আরবীতে 'আমক এর আসল অর্থ হল কুয়ার তলা, যেহেতু কুয়ার তলা একটি সমতল ভূমি যা উঁচু দেয়াল দ্বারা ঘেরা থাকে। এই এলাকাটি সবসময়ই তুর্কি ভাষাভাষীদের কাছে আমুক উপত্যকা নামে পরিচিত ছিল যা দ্বারা বুঝা যায় যে এমনকি অনারবদের কাছেও এর নাম অদ্যাবধি তাই আছে যা পূর্বে ছিল।



দাবিক এবং আল-আ'মাক চিহ্নিতকারী একটি ম্যাপ

কেউ কেউ বলেছেন যে আল-আ'মাক আসলে ইয়ামেনে অবস্থিত একটি জায়গা অথবা এর অবস্থান অন্য কোথাও কারণ পৃথিবীতে এরূপ সমতল পর্বতঘেরা জায়গা আরও আছে। যদি তাই হয় তবে এরূপ কয়েক হাজার ভৌগলিক অঞ্চল বিদ্যমান আছে যেগুলো এই ঘটনার সম্ভাব্য স্থান হবার দাবী রাখে। কিন্তু হাদিসের আলোকে একথা প্রায় স্পষ্ট যে আল-আ'মাক এমন একটি জায়গা যা দাবিক-এর একেবারে পাশেই অবস্থিত। আ'মাক-এর পার্শ্ববর্তী দাবিক-এর নাম উচ্চারণ করার ব্যাপারটি খুবই কম সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল তথাপি আ'মাক-এর কথা যখন উল্লিখিত হয় তখন আমাক-এর পার্শ্ববর্তী একটি এলাকাকেই সম্বোধন করা হয়।

আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে এই জায়গায়ই মুসলিমদের আক্রমন করার জন্য রূম আসবে এবং এটি আরেকটি পরিষ্কার দলিল যে তুরষ্কই আমাদের সময়ের রূম (এবং খুব সম্ভব ভবিষ্যৎবাণীতে বর্ণিত যুদ্ধের সময়ের) যেহেতু তুরষ্কই দাবিকের আশপাশের এলাকাসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে সে সাথে আ'মাক-এর বেশিরভাগ অংশও, এবং এই কথাও গ্রহনযোগ্যতার দাবি রাখেনা যে তুরষ্কের ভূমির উপর দিয়েএকমাত্র তুরষ্ক ছাড়া অন্যকেউ আশ-শামে ডুকবে মুসলিমদের আক্রমণ করার জন্য। যদি তুরষ্ক আগ্রাসন চালায় তবে এই ব্যাপারটি কৌশলগতভাবে প্রায় নিশ্চিত যে তারা আল-আ'মাক এবং দাবিক হয়ে প্রবেশ করবে এবং এই পৃথিবীর জাতিসমূহের মাঝে তুরষ্ক একমাত্র জাতি যার

এই জায়গায় প্রবেশের ক্ষমতা রয়েছে। যেকোন মিলিটারি স্ট্র্যাটেজিস্ট এব্যাপারে একমত হবেন যে তুরস্ক যদি আশ-শামের উপর আক্রমণ করে তবে তার জন্য সবচেয়ে উত্তম স্থান হল দাবিক এবং আশ-শামের আশপাশের এলাকা।

উপরোক্ত হাদিসটির বর্ণনার ধারাবাহিকতায় রুম-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী সৈন্যদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছেঃ

فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَايَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَبَدًا وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ اَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ
وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ لَايُفْتَنُونَ أَبَدًا فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ

“তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং এক তৃতীয়াংশ পলায়ন করবে, আল্লাহ তাদের কখনোই ক্ষমা করবেননা। এক তৃতীয়াংশ মারা যাবে এবং তারা হবে আল্লাহর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ। এক তৃতীয়াংশকে বিজয় দান করা হবে এবং তাদেরকে আর কখনো পরীক্ষার সম্মুখীন করা হবেনা এবং তারা ইস্তাম্বুল বিজয় করবে” [সহীহ মুসলিমঃ ২৮৯৭]।

হাদিসের এই অংশ এই ব্যাপারটি স্পষ্ট করে দেয় যে রুম-এর সাথে প্রথম যুদ্ধটি ইস্তাম্বুল বিজয়ের পথ উম্মোচন করবে যাতে করে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তুরস্ক মুসলিমদের বিরুদ্ধে জড়িত থাকবে যারা তাকে পরাজিত করবে। যদিও হাদিসটির ভাষায় একথা স্পষ্ট নয় যে এই বিজয়ের সময় ইস্তাম্বুল রুম-এর অংশ হিসেবে থাকবে, তথাপি আনুষঙ্গিক আলোচনা হতে একথা প্রতীয়মান হয় যে রুম-এর পরাজয়ই ইস্তাম্বুল বিজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে যার ফলে এই কথা প্রতীয়মান হয় যে ইস্তাম্বুল রুম-এর অংশ, সেই সাথে এই কথাও আমাদের জানা আছে যে আমাদের সময়ে ইস্তাম্বুল তুরস্কের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং এর পতন না হলে এই অবস্থা পরিবর্তিত হবার সম্ভাবনা খুবই কম। এই কথাও বলা হয়েছে যে, যে সকল মুসলিমরা রুম-কে পরাজিত করবে তাদেরকেই আবার ইস্তাম্বুল বিজয়ের জন্য পাঠানো হবে। এর দ্বারা আবারো বুঝা যায় যে পুরো ব্যাপারটিই ইসলামিক স্টেট ও রুম-এর একই যুদ্ধেরই অংশ হবে। আশ-শামেই মুসলিমরা রুম-এর মুখোমুখি হবে এবং তারা ইস্তাম্বুল বিজয়ের পর আবার আশ-শামেই ফিরে আসবে এই বাস্তবতা হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে মুসলিমদের ঘাঁটি হবে আশ-শামে।

আব্দুল্লাহ বিন মাস’উদ (রাঃ) হতে এক বর্ণনায় তিনি মুসলিমদের সাথে রুম-এর যুদ্ধের ব্যাখ্যা দান করেনঃ

لَا تَقُومُ حَتَّى لَايُقْسَمُ مِيْرَاثٌ وَلَا يُفْرَحَ بِغَنِيْمَةٍ . ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا ـ وَنَحَّاهَا نَحْوَ الشَّأْمِ ـ فَقَالَ عَدُوٌّ يَجْمَعُوْنَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ . قُلْتُ الرُّومَ تَعْنِي قَالَ نَعَمْ وَتَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالِ رَدَّةٌ شَدِيدَةٌ فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً

"'নিশ্চই ততক্ষন পর্যন্ত শেষ সময় আসবেনা যতক্ষন লোকেরা উত্তরাধিকার বন্টন করবেনা এবং গনিমতের মাল নিয়ে আনন্দ করবেনা'। এরপর তিনি তাঁর হাত দ্বারা আশ-শামের দিকে ইশারা করে বললেন, 'শত্রুরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে জড়ো হবে এবং মুসলিমরা তাদের বিরুদ্ধে জড়ো হবে'। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনি কি রুম-এর কথা বলছেন?' এবং তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এবং প্রচন্ড এক যুদ্ধ হবে এবং মুসলিমরা আমৃত্যু যুদ্ধ করার জন্য একটি সৈন্যদল তৈরী করবে যা বিজয়ী না হয়ে ফিরবেনা'" [সহীহ মুসলিম-২৮৯৯]।

এই হাদিসের ধারাবাহিক বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে যে এটি এমন এক যুদ্ধ যা এর আগে কোন যুদ্ধে দেখা যায়নিঃ

يَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً لَمْ يُرَ مِثْلُهَا حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَخِرَّ مَيْتًا

"তারা এমনভাবে যুদ্ধ করবে যা ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি, তা এতই ভয়াবহ হবে যে এমনকি তাদের সৈন্যদলের উপর দিয়ে যদি পাখি উড়ে যায় তবে এর শেষ প্রান্তে পৌঁছানোর আগেই তা মারা যাবে"।

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে যুদ্ধ কেবল ভূমিতে অবস্থানকারীদেরই প্রভাবিত করবেনা বরং এমনকি যারা আকাশে থাকবে তারাও এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর দ্বারা খুব সম্ভব এরিয়্যাল বম্বিংকে (বিমান হতে বম্বিং) বোঝাচ্ছে যা আধুনিক যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য, যার দ্বারা এমনকি আকাশের পাখিও যুদ্ধের ভয়াবহতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তিনি এরপর বললেন এভাবে ৪ দিন চলতে থাকবে প্রতিদিন মুসলিমরা রুম-এর মোকাবেলায় আরও বেশি বেশি সৈন্য পাঠাতে থাকবে এবং প্রতি ১০০ জনে মাত্র ১ জন বেঁচে থাকবে। এই কারণে কেউই উত্তরাধিকার ও গনিমতের মাল নিয়ে খুশি প্রকাশ করবে না। তিনি উল্লেখ করেন যে এরপর ভন্ড মসীহ আত্মপ্রকাশ করবে এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন মুসলিমদের মধ্য হতে ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি ঘোড়সওয়ারী দল এগিয়ে যাবে

অবস্থা পর্যবেক্ষন করার জন্য যারা হবে সেই সময়কার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার এবং তিনি তাদের নাম এবং তাদের ঘোড়ার গায়ের রং পর্যন্ত জানেন। এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হল আগের হাদিসটি আগের হাদিসটি (সহীহ মুসলিম-২৮৯৭) যেখানে ইস্তাম্বুল বিজয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, বলা হয়েছে যে মুসলিমরা ইস্তাম্বুল বিজয় করার পরপরই ভন্ড মসীহ আবির্ভুত হবে, অর্থাৎ দুটি হাদিসেই একই ঘটনার ব্যাপারে বলা হচ্ছে এবং নিশ্চিতভাবে তা নির্দেশ করে যে মুসলিম ও রুম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধই হবে একমাত্র যুদ্ধ এবং এটি হবে একটি ভয়াবহ যুদ্ধ এবং অল্প সময়ের মাঝেই ইস্তাম্বুল বিজয় হবে, অর্থাৎ ইসলামিক স্টেইট ও রুম এই দুই দলের মাঝে যুদ্ধের ফলেই এই বিজয় ঘটবে।

ঘটনাসমূহের এই ধারাবাহিকতা আরেকটি হাদিসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যার আলোচনায় এসেছে সেই সময়ে কি ঘটবেঃ

سَتُقَاتِلُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهَا الله ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ـ قَالَ جَابِرٌ فَمَا يَخْرُجُ الدَّجَّالُ حَتَّى تُفْتَحَ الرُّومُ

“তোমরা আরব উপদ্বীপের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদেরকে বিজয় দেয়া হবে। এরপর তোমরা রুম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তোমাদেরকে বিজয় দান করা হবে। এরপর তোমরা দাজ্জাল-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদেরকে বিজয় দান করা হবে”। এই প্রসঙ্গে জাবির (রাঃ) বলেনঃ “তোমরা রুম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আগ পর্যন্ত দাজ্জালের আবির্ভাব হবেনা” [সুনান ইবন মাজাহ-৪০৯১]।

এর দ্বারা আবারো প্রমাণিত হয় যে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে মুসলিমদের হাতে ইস্তাম্বুল বিজয়ের পর।

ইস্তাম্বুলের ক্রম-বিজয়ের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি ব্যাপার লক্ষনীয় যে এটি একটি পরিষ্কার দলিল যে তুর্কির মুরতাদ শাষকেরা অবৈধ কারণ তারা যদি বৈধ হত এবং ইসলামের রক্ষক হত (যা কিছু বিভ্রান্ত লোকেরা বিশ্বাস করে থাকে) তবে মুসলিমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেননা এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের পরাজিতকারী মুসলিমদের প্রশংসা করতেননা। যদি কেউ বলে যে হয়তবা এখনকার শাষকগোষ্ঠী এবং তাদের চিন্তাধারার লোকেরা সেই সময় ক্ষমতায় থাকবেনা তবে এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তারা সঠিক পথের উপর নেই। কারণ রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলেছেন যে জুলুমের যুগ শেষ হবার পর নবুয়তের আদলে খিলাফাহ আসবে এবং তিনি কখনোই বলেননি যে যুলুমের পর আবার যুলুম আসবে যার দ্বারা দেখা যায় যে যখন সত্যবাদীরা ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত

করবে তখন তা যালিমদের উৎখ্যাত করবে। এটি একটি প্রমাণ যে তুরষ্কের বর্তমান ক্ষমতাসীনরা মুরতাদ এবং তাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে।

এর পরের হাদিস আমাদের বর্ণনা করে ইস্তাম্বুল বিজয়কারী সেনাদলে কারা থাকবে এবং এর তারা কিভাবে ইস্তাম্বুল বিজয় করবে।

سَمِعْتُمْ بِمَدِيْنَةٍ جَانِبٌ مِّنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِّنْهَا فِي الْبَحْرِ قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهاَ سَبْعُوْنَ أَلْفًا مِّنْ بَنِيْ إِسْحَاقَ فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوْا فَلَمْ يُقَاتِلُوْا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوْا بِسَهْمٍ قَالُوا لَا إِلَاهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ فَيَسْقُطُ اَحَدُ جَانِبَيْهَا قَالَ ثَوْرٌلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ الَّذِي فِي الْبَحْرِ ثُمَّ يَقُولُوا اثَّانِيَةَ لَا إِلَاهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ فَيَسْقُطُ اَحَدُ جَانِبَيْهَا اَلأَخَرُ ثُمَّ يَقُوْالُوْا اَثَّالِثَةَ لَا إِلَاهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ فَيُفَرَّجُ لَهُمْ فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُوْنَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ اصَّرِيْخُ فَقَالَ إِنَّ الدَّاجَّالَ قَدْ خَرَجَ فَيَتْرُكُوْنَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرجِعُوْنَ

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা কি একটি শহরের নাম শুনেছ যার এক অংশ পানিতে আর এক অংশ ডাঙ্গায়?” তাঁরা বললেন, “জ্বী শুনেছি”। রাসুলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বললেন, “ততক্ষন পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবেনা যতক্ষন ইসহাক ﷺ এর বংশের ৭০০০০ ব্যাক্তি একে আক্রমণ না করে। যখন তারা এতে অবতরন করবে তখন তারা না অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করবে না তারা এতে কোন যুদ্ধের সূচনা করবে। তারা বলবে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার”। এর ফলে এর এক অংশ তাদের হাতে আসবে। অতঃপর তারা দ্বিতীয়বার আবার বলবে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার”। এর ফলে শহরটি পুরোপুরি তাদের হাতে এসে পড়বে এবং তারা এতে প্রবেশ করবে। তারা তা হতে গনিমত সংগ্রহ করবে এবং নিজেদের মধ্যে তা বন্টন করতে থাকবে যখন একজন এসে তাদেরকে চিৎকার দিয়ে বলবে, “দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে”। সুতরাং তারা সবকিছু ফেলে প্রত্যাবর্তন করবে (শাম-এর দিকে)।

আমাদেরকে বলা হয়েছে যে আগ্রাসী সৈন্যদলে সত্তর হাজার মুসলিম থাকবে যারা হবে ইসহাক ﷺ এর বংশধর। এই হাদিস যারা শুনেছেন তাদের অনেকেই বিভিন্ন জল্পনা কল্পনা করে থাকেন যে বর্ণিত ইসহাক ﷺ এর বংশধর কারা হবেন। কেউ কেউ বলে থাকেন যে তারা নিশ্চই সেই সকল ইহুদিরা হবেন যারা ইসলাম গ্রহন করেছেন কারণ ইহুদিরা (বনী ইসরাইল) ইসহাক ﷺ এর বংশধর। যদিও এই কথা সত্য যে ইহুদিরা ইসহাক ﷺ এর

বংশধর তারা ইসহাক ﷺ এর একমাত্র বংশধর নয়। ইসহাক ﷺ এর দুই পুত্র ছিলেন, ইয়াকুব ﷺ, যিনি ইসরাইল নামেও পরিচিত ছিলেন, এবং ইসাউ যার কথা আগেই বর্ণিত হয়েছে। আমরা জানি যে ইসাউ এর বংশধরেরা বনী ইসরাইলের আদিনিবাসের, যা কিনা বর্তমানে জর্ডান ও সিরিয়ার অন্তর্গত, পূর্বদিকে বসবাস করতেন। এবং আজকের যুগে সেই সকল উত্তরসূরিরা সমগ্র আশ-শাম অঞ্চলে বসবাস করেন সম্ভবত তারা জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্টের অন্তর্ভুক্ত। তাই আশ-শামের মুসলিমদেরই সত্তর হাজার বনী ইসহাক-এর মধ্য হতে হবার সম্ভাবনা বেশি। এছাড়া এই ব্যাপারটি আরো যুক্তিসঙ্গত হবার কারণ হল তারা রুম-এর একেবারে সীমান্তেই অবস্থিত।

এর পরের হাদিসে বর্ণিত হয়েছেঃ

ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ فَيَغْدِرُوْنَ، فَيَأْتُوْنَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ غَايَةً، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اِثْنَ عَشَرَ أَلْفًا

তোমাদের সাথে বনী আল-আসফারের সাথে একটি চুক্তি হবে কিন্তু তারা তা ভঙ্গ করবে। তারা আশিটি গায়া নিয়ে তোমাদের মোকাবেলায় আসবে এবং প্রতিটি গায়ায় থাকবে বার হাজার সৈনিক। [সহীহ আল-বুখারী ৩১৭৬]।

রুম প্রসঙ্গে এই হাদিসটি অনেকেই বর্ণনা করে থাকেন কিন্তু প্রথম যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হল এতে আসলে রুম-এর কথা বলা হয়নি। এতে বলা হয়েছে বনী আসফার-এর কথা এবং আগেই বলা হয়েছে যে বনী আসফার হল একটি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী যারা ইসাউ-এর বংশধর এবং ইসাউ-এর উত্তরসূরীরা শাম-এর সর্বত্র জুড়ে বিদ্যমান যদিও ঐতিহাসিকভাবে তারা জর্ডান কেন্দ্রিক ছিল। আগেই বর্ণনা করা হয়েছে যে ঈসা صلى الله عليه وسلم এর সময়ে রোমানদের সাথে তাদের মিত্রতা ছিল। কিন্তু ফিলিস্তিন/জর্ডান অঞ্চলে রুম-এর পরাজয়ের পর তারা আর রোমানদের অধীনস্ত ছিলনা এবং তারা চলে আসে মুসলিম শাষনের অধীনে। আজ পর্যন্ত তারা প্রায় একই এলাকায়ই বসবাসরত আছে তাই যখন তাদের কথা উল্লেখ করা হয় তখন তাদেরকে রুম বলে গণ্য করা ভুল কারণ রুম কোন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী নয়, রুম-এর পরাজয়ের পর তারা দেশান্তরিত হয়নি বা মুসলিমরা তাদের আশ-শাম হতে তাড়িয়েও দেননি। একথা মনে রাখা দরকার যে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন “বনী আল-আসফার” তিনি “রুম” বলেননি এবং তিনি যদি “রুম” বলতে চাইতেন তবে তিনি তা বলতেন। বনী আল-আসফারই রুম একথা বলা চরম ভুল কারণ বনী আল-আসফার একটি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী কোন রাজনৈতিক স্বত্তা নয়। একটি একই ধরণের ব্যাপার উল্লেখ করা যায় ভারতীয়দের ব্যাপারে। কোন এক

সময়ে তারা ছিল ব্রিটিশ কারণ ব্রিটিশরা তাদেরকে শাষন করেছে এবং তাদেরকে ব্রিটিশ বানিয়েছে। এর জনগণ গাইত "God save the Queen" এবং ইউনিয়ন জ্যাক-এর পতাকা উড়াত। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দূর্বল হবার সাথে সাথে তারা ভারতের কর্তৃত্ব হারায় এবং আজকের যুগে ভারতীয়রা আর ব্রিটিশ নয় বরং তারা নিজেদের ভূমি নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করে। ঠিক তেমনিভাবেই বনী আল-আসফার নিশ্চিতভাবেই একসময় রুম-এর অংশ ছিল কিন্তু আজ তারা নিজেরাই নিজেদের দেশ চালায় এবং নিজেদের ব্যাপারগুলো নিজেরাই দেখাশোনা করে। আমালেক ও এর মত অন্যান্য বড় গোত্র হতে উদ্ভুত হয়ে ইসাউ-এর বংশধরেরা শাম এবং এর আশপাশের এলাকাসমূহে বসতি স্থাপন করে স্থায়ী হয়।

তাই এই হাদিস দেখে বুঝা যায় যে এক্ষেত্রে দুইটি সম্ভাব্য বিষয় রয়েছে। হয় বনী আল আসফার বলতে ইসাউদের মূল ভূমিকে বুঝানো হয়েছে যারা আমাদের সময়ে মূলঃত জর্ডানিয়দের দিকে নির্দেশ করে অথবা বনী আসফার দ্বারা তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা তুরষ্কে স্যাটেল হয়েছে যা রুম-এর অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে। বাস্তবিক পক্ষে এখানে একটি চুক্তির কথা বলা হয়েছে যা ইঙ্গিত করে যে এই চুক্তি রুম-এর সাথে হবে (যা পরবর্তী হাদিসে বর্ণিত হয়েছে)। কিন্তু এই কথা ধারণা করা ভুল হবে যে এই দুটি চুক্তি আবশ্যম্ভাবীভাবে একই চুক্তি হবে কারণ এটিও পুরোপুরি সম্ভব যে বিভিন্ন পক্ষ বিভিন্ন চুক্তি করতে পারে এবং যদি এরুপ কোন ব্যাপার সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে যে এই চুক্তিই সেই একই চুক্তি যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তবে আপনাআপনিভাবে আমাদের এই কথা ভাবা উচিত হবেনা যে উভয় চুক্তিই একই চুক্তি।

আমাদেরকে বলা হয়েছে যে সঠিক পথে পরিচালিত মুসলিমরা বনী আল-আসফারের সাথে একটি চুক্তি (হুদনাহ) করবে। হুদনাহ শব্দের অর্থ একটি বিধিবদ্ধ চুক্তি হতে নিয়ে সাধারণ শত্রুতার সমাপ্তির মত যেকোন কিছুকে বুঝাতে পারে। অর্থাৎ এর অর্থ হল এক পর্যায়ে গিয়ে মুসলিমরা বনী আসফারের সাথে যুদ্ধ করবেনা এবং এরপর তারা তাদের সাথে চুক্তিভঙ্গ করবে এবং দুই পক্ষের মাঝে যুদ্ধের সূচনা হবে। আমাদেরকে বলা হয়েছে যে বনী আসফার ৮০টি গায়াহ' নিয়ে হাজির হবে। 'গায়াহ' শব্দটির বেশ কয়েকটি অর্থ রয়েছে তাই আমাদের উচিত সব কয়টি সম্ভাব্য অর্থকে বিবেচনায় আনা। সবচেয়ে বেশি সম্ভাব্য অর্থ হল 'পতাকা' কারণ যুদ্ধ অবস্থায় এই কথা দ্বারা ব্যাটালিয়নের পতাকা বা জাতীয় পতাকাকে বুঝায়। অথবা এর দ্বারা কোন একটি উদ্দেশ্যে গঠিত যে কোন ধরণের একটি জোট বুঝাতে পারে। কিন্তু তার পরেও এই ক্ষেত্রে এর অর্থ সামরিক ব্যাটালিয়ান-এর দিকেই নির্দেশ করে। আমাদের বলা হয়েছে যে প্রতিটি ডিভিশনে ১২০০০ সৈন্য থাকবে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে প্রায় দশ লক্ষের কাছাকাছি লোক থাকবে (প্রকৃত সংখ্যা ৯৬০,০০০)। এর দ্বারা বুঝা যায় যে এটি হবে একটি বিশাল বাহিনী যা ছোট ছোট ডিভিশনে বিভক্ত থাকবে। অনেকে ধারণা করেন যে এর দ্বারা আমাদের

সময়ে দেখা জোট বাহিনী (কোয়ালিশন ফোর্স) বুঝানো হয়ে থাকতে পারে যেখানে অনেক জাতি একত্রিত হয়, প্রতিটি জাতি একজোট হয়ে যুদ্ধ করার জন্য এর সৈন্য বাহিনীর একটি অংশ দান করে থাকে। এক্ষেত্রে যা উল্লেখ্য তা হল আমাদের সময়ে আমরা যে জোট বাহিনী দেখে থাকি তাদের নেতৃত্ব দিয়ে থাকে আমেরিকা যা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যুদ্ধরত এলাকায় তারা মূল নেতৃত্বকারী কোন মিত্র খুঁজে পেতে অসমর্থ হয়। তাদের কাছে যে দুজন সম্ভাব্য প্রার্থী সবচেয়ে বেশি আকর্ষনীয় হয়ে উঠেছে তারা হল জর্ডান ও তুরষ্ক। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে দুদেশই এই ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করছে বলে মনে হচ্ছে কারণ যুদ্ধের ব্যাপারে তারা সাধারণভাবে শত্রুভাবাপন্নতা প্রকাশ করেনা। তাই জর্ডান ও তুরষ্ক উভয়েই এই মুহূর্তে হুদনাহ অবস্থায় আছে যদিও তা খুব শীঘ্রই পরিবর্তিত হবার সম্ভাবনা আছে।

এর পরের হাদিসে বলা হয়েছে-

سَتُصَالِحُكُمُ الرُّومُ صُلْحًا آمِنًا ثُمَّ تَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ ثُمَّ تَنْصَرِفُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِي تُلُولٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصَّلِبِ الصَّلِبَ فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيبُ. فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَقُومُ إِلَيْهِ فَيَدُقُّهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ وَيَجْتَمِعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ

“রোমানরা তোমাদের সাথে একটি শান্তি চুক্তি করবে এবং তারপর তোমরা এবং তারা মিলে একই শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং তোমরা জয়যুক্ত হবে। তোমরা গণিমত নেবে এবং পরষ্পর যুদ্ধ করবেনা ততক্ষন পর্যন্ত যতক্ষণ না তোমরা এক ছোট ছোট টিলা সমৃদ্ধ এক ঘাসযুক্ত ময়দানে আস। এরপর ক্রসের লোকেদের মাঝের এক লোক ক্রস উঁচু করবে এবং বলবে ‘ক্রস-এর বিজয় হয়েছে’। মুসলিমদের মধ্য হতে এক ব্যাক্তি এই কথায় রাগান্বিত হবে এবং সে ক্রসটিকে তার জায়গা থেকে ফেলে দেবে। এর কারণে রোমানরা তোমাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং মালহামা-র (সবচেয়ে বড় যুদ্ধ) জন্য জড়ো হবে।”

এই হাদিসটিতে সুনির্দিষ্টভাবে রুম-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাই জানতে পারছি যে এতে সুনির্দিষ্টভাবে তুরষ্কের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা আগের হাদিসের ব্যাতিক্রম যাতে (আগের হাদিসে) এই ব্যাপারটি অস্পষ্ট ছিল যে এতে ঠিক কার উল্লেখ করা হচ্ছে। এতে বলা হচ্ছে যে সঠিক পথে থাকা মুসলিমরা রুম-এর সাথে একটি চুক্তিতে (সুলহ) আবদ্ধ হবে এবং একই শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে। আবারো হুদনাহ-এর মতই সুলহ কোন

বিধিবদ্ধ চুক্তি নয় এটি হতে পারে দুপক্ষের মাঝে বিধিবদ্ধহীন শত্রুতার অবসানের একটি অবস্থা মাত্র। আমাদের বলা হয়েছে যে দুপক্ষের সাধারণ শত্রু পরাজিত হবে এবং এর পরও উভয় পক্ষ পরষ্পর যুদ্ধ করবেনা যতক্ষণ না ক্রসের লোকেদের এক ব্যক্তি দাবী করে যে ক্রসের দ্বারা বিজয় অর্জিত হয়েছে যার ফলে উভয় পক্ষের মাঝে শত্রুতার সূচনা হবে। এক্ষেত্রে যে কথাটি উপলব্ধি করা দরকার তা হল 'ক্রসের লোক' কথাটি ওহীর অন্য কোথাও ব্যাবহৃত হয়নি। সাধারণত খ্রীষ্টানদের নাযারেন (নাসারা) বলা হয় কিন্তু এই হাদিসে লোকটিকে নাযারেন বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে ক্রসের লোক। এই কথাটি ক্রুসেডার বা সালিবি এর সমার্থক। ঠিক যেমন আহলুল কিতাব-এর কোন ব্যক্তিকে কিতাবি বলা হয় ঠিক তেমনি সালিবি (ক্রুসেডার) বলা হয় আহলুস সালিব বা ক্রসের লোকদেরকে। তাই এ থেকে মনে হচ্ছে যে আল্লাহর রাসুল ﷺ আমাদের জানাচ্ছেন যে এই লোকটি কোন সাধারণ খ্রীষ্টান হবে না, সে হবে একজন ক্রুসেডার, খ্রীষ্টানদের একটি বিশেষ দল যারা মুসলিমদের ভূমিতে তাদের ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে। যেহেতু আমাদের সময়ে আমেরিকা এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি একনিষ্ঠ এবং বুশ খোলাখুলিভাবেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধকে ক্রুসেড বলে সম্বোধন করেছে তাই এই ব্যাক্তিটি হয়ত কোন আমেরিকান সৈন্য অথবা তাদের কোন মিত্র বাহিনীর একজন সদস্য হতে পারে যার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলিমটি তার (ক্রুসেডার সৈন্য) করা এই ক্রসের প্রসংশার প্রতিবাদ করবে এবং ক্রসে আঘাত করবে যার ফলে এটি তার স্থানচ্যুত হয়ে পড়বে যার ফলে মুসলিম ও রুম-এর মাঝে শত্রুতা সূচনা হয়ে যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

এই হাদিস যারা পড়েছেন তাদের অনেকে ভুল ভাবে পড়েছেন এবং ধারণা করেছেন যে ক্রুসেডারটি রুম-এর লোক হবে, কিন্তু এই কথাটি ভুল। যদি সে রুম-এর লোক হত তবে বলা হত যে রুম হতে কিন্তু যেহেতু মুসলিম এবং রুম-কে হাদিসে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এই কথাটিও সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে যে সে এই দুই দলের কোনটি হতেই নয় বরং সে এক ভিন্ন জাতি হতে উদ্ভুত যারা ক্রুসেডার/ক্রস-এর লোক। যদি হাদিসে বলত 'রুম-এর মধ্য হতে এক ব্যাক্তি' অথবা 'তাদের মধ্য হতে এক ব্যাক্তি, তবে আমরা বলতাম যে এই লোকটি তাদের মাঝে অবস্থানরত এক খ্রীষ্টানদের ব্যাক্তি। কিন্তু ব্যাপারটি এরুপ নয় এবং আমাদের বলা হয়েছে যে সে একজন ক্রুসেডার কোন এক অজানা কারণে যে সেই সময়ে রোমানদের মাঝে অবস্থানরত থাকবে অথবা বেশি সম্ভব সে রুম-এর মিত্র বাহিনীর একজন সদস্য। এর মানে এই কথা বুঝায় না যে মুসলিমরা ক্রুসেডারদের সাথে কোন চুক্তি করবে। বরং এর দ্বারা কেবল এই বুঝায় যে মুসলিমরা রুম-এর সাথে কোন যুদ্ধ করবেনা যেই রুম ক্রুসেডারদের সাথে মিত্র চুক্তিতে আবদ্ধ থাকবে এবং সেই সময়ে তারা একই শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য পরষ্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবেনা।

একটি কথা জেনে রাখা উচিত যে এই হাদিসে এই কথা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে ক্রসের লোকেরা রুম হতে একটি ভিন্ন দল কারণ তাদেরকে রুম-এর অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। এই কথাটি আবারো প্রমাণ করে যে খ্রীষ্টানরাই রুম নয় যা অনেকে দাবী করে থাকেন। বরং তারা হবে রুম-এর মিত্র।

আমাদের বর্তমান সময়ে আমরা দেখতে পাই যে মুসলিমরা রুম-এর সাথে একটি অলিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ যদিও তারা পাশাপাশি অবস্থিত। রুম এবং মুসলিমদের মাঝে পরিষ্কার শত্রুতা বিদ্যমান হওয়া সত্ত্বেও তারা পরষ্পর যুদ্ধে করছেনা কারণ তাদের উভয়ের এক সাধারণ শত্রু আছে এবং তারা হল সেক্যুলার কুর্দি। রুম এবং মুসলিম উভয়েই কুর্দিদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণে বোঝা যায় তারা আপাতত পরষ্পর শত্রুতা ভুলে আছে এবং সম্ভবত তারা তা ভুলেই থাকবে যতক্ষন না এই শত্রু পরাজিত হয়। আগেই বর্ণিত হয়েছে যে রুম এই মুহূর্তে ন্যাটোর অংশ হিসেবে ক্রুসেডারদের সাথে মিত্রতায় আবদ্ধ। তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবার ক্ষেত্রে সবচেয়ে যোগ্য প্রার্থী এবং ক্রুসেডাররা এই কাজে লিপ্ত হবার জন্য তাদেরকে চাপ দিয়ে আসছে। কিন্তু স্থানীয়ভাবে কুর্দিদের সাথে যুদ্ধের কারণে তারা মুসলিমদের উপর, যারা কিনা উভয়ের সাধারণ শত্রুর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, চড়াও হতে নারাজ। এই বর্তমান অবস্থা হাদিসে বর্ণিত ঘটনাটির অংশ হতেও পারে আবার নাও হতে পারে কিন্তু তা এর অর্থের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত এবং খুব ভালভাবেই আমাদেরকে বর্ণিত ওহীর অংশ হিসেবে পরিগণিত হবার যোগ্যতা রাখে। যদি কুর্দিরা পরাজিত হয় তবে খুব সম্ভব ক্রুসেডারদের চাপের কারণে রুম মুসলিমদের উপর চড়াও হবে। অবশেষে এই ব্যাপারটি অবাক করার মত কোন বিষয় হবেনা যে রুম-এর হাতে কুর্দদের পরাজয় ক্রুসেডারদের জন্য একটি আনন্দের ব্যাপার হবে কারণ আমারিকা ও তার মিত্ররা বহু বছর ধরে কম্যুনিস্ট নেতৃত্বাধীন কুর্দদের মোকাবেলা করছে এবং তাদরকে টেরোরিস্ট আখ্যা দিয়ে আসছে। ঠিক যেমন খ্রীষ্টান ক্রুসেডারেরা পূর্বে কম্যুনিজম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আনন্দিত হয়েছিল ঠিক তেমনি তারা নাস্তিক কম্যুনিস্ট কুর্দিদের পরাজয়কে নিজেদের বিশ্বাসের বিজয় বলে গণ্য করবে।

এই দৃশ্যপটটি হয়তবা হাদিসে বর্ণিত ঘটনার সাথে হুবহু নাও মিলতে পারে কিন্তু এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে হাদিসে বর্ণিত ঘটনাগুলো কিভাবে ঘটতে পারে এবং আমাদের সময়ের অবস্থাবলী হাদিসের ঘটনার সাথে হুবহু মিলে যায়। আমাদের সময়ের অন্য কোন দৃশ্যপট হাদিসের সাথে এভাবে হুবহু মিলে না।

হাদিসটি আমাদের বলছে যে যখন চুক্তি ভঙ্গ হবে এবং মুসলিমরা রুম-এর সাথে যুদ্ধ করবে তখন মালহামা (সবচেয়ে বড় যুদ্ধ) আরম্ভ হবে। অর্থাৎ ইস্তাম্বুলের বিজয় হবে এর শীর্ষাবস্থা যদি যুদ্ধের চরম অবস্থা নাও হয়। এইখান থেকেই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে

এবং হয়ত রুম-এর অস্তিত্ব চিরতরে লোপ পাবে। এ ব্যাপারে একটি মতপার্থক্য আছে যে ইস্তাম্বুল-এর বিজয়ের পর রুম-এর অস্তিত্ব থাকবে কিনা। কিন্তু কমপক্ষে এটি পরিষ্কার যে ইস্তাম্বুল হারাবার পর তারা একটি বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এই বিতর্কের কারণ নিম্নোক্ত হাদিসটিঃ

تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّمُ أَكْثَرُ النَّسِ

'কেয়ামত তখনি সংঘটিত হবে যখন রুম-এর জনসংখ্যা সর্বাধিক হবে'। [সহীহ মুসলিম, ২৮৯৮]

এই হাদিসটি আমাদেরকে একটি সময়ের কথা বলছে ঠিক যে সময়ে সত্যিকারের কেয়ামত সংঘটিত হবে, যে সময়ে কেয়ামতের সমস্ত বড় নিদর্শনসমূহ একের পর এক চলে যাবে যেমন দাজ্জালের আবির্ভাব এবং সূর্যের পশ্চিম দিকে উঠা। সেই সময়ে রুম হবে জনসংখ্যার দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ট অর্থাৎ হয় তারা সংখ্যার দিক থেকে অনেক বেড়ে যাবে অথবা মালহামা, দাজ্জাল, ইয়া'জুজ-মা'জুজের হত্যাকান্ড ইত্যাদি কারণে বাকি মানবজাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। যাই হোক না কেন এই কথাটি আমাদের পরিষ্কার বলা হয়েছে যে শেষের সেই দিনে রুম হবে জনসংখ্যার দিকে সর্বাধিক। এই কথাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কেয়ামত আসার পূর্বে একটি বাতাস প্রবাহের দ্বারা পৃথিবী থেকে শেষ মুমিনটিকে তুলে নেয়া হবে (মারা যাবে) যার ফলে কাফের ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট থাকবেনা। তাই ব্যাপারটি এইভাবে দেখা উচিত নয় যে মুসলিমদের উপর রুম কোনভাবে বিজয়ী হতে পারবে। বরং সত্যিকার মুমিনগণ মারা যাবে এবং রুম থেকে যাবে এর অধিকাংশ জনগোষ্ঠী নিয়ে।

এই হাদিসটি যারা পড়েছেন তাদের মাঝে অনেকেই এর সম্পর্কে ভুল বুঝেছেন এবং ধারণা করেছেন এর দ্বারা আমাদের সময় অর্থাৎ মালহামার পূর্বের সময়কে বুঝানো হচ্ছে। কিন্তু হাদিসটি পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে যে এটি হবে একেবারে শেষ সময়ে শেষ দিনে। আমাদের সময়ে রুম-এর জনসংখ্যা সর্বাধিক নয়। বরং আমাদের সময়ে সংখ্যার দিকে সবচেয়ে বেশি হল চাইনিজ ও ভারতীয়রা এবং রুম ও ইউরোপিয়ানরা হল প্রকৃতপক্ষে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী। সেই হিসেবে একভাবে হতে পারে রুম তখনো টিকে থাকবে, কিন্তু যেহেতু এটি পৃথিবী শেষ হবার ঠিক আগের সময় এবং সেই সময়ে কোন মুমিন থাকবেনা আমরা দুয়া করি আমাদের যেন দেখতে না হয় তা (কিয়ামত) কিভাবে হবে। বরং আমরা দুয়া করি যেন আমরা সত্যিকার মুসলিম হই যাদেরকে কেয়ামতের দিবসের ভয়াবহতা হতে বাঁচানো হবে।

শেষদিবসের ঘটনাবলীর ঘটনার ধারাবাহিকতা

উপরের হাদিসগুলো আমাদেরকে একটি সাধারণ ধারণা দেয় যে মুসলিম ও রুম-এর মধ্যে কি হবে এবং আমরা ঘটনাগুলো কিভাবে ঘটবে তার একটি সাধারণ ধারাবাহিকতার ছক তৈরী করতে পারি। এই কথাটি উল্লেখ করা দরকার যে কিছু হাদিস আছে যা উপরে বর্ণনা করা হয়নি এবং তার কারণ হল এগুলো সহীহ বা বিশুদ্ধ নয়। হতে পারে কেউ কেউ এই হাদিসগুলো শুনেছেন এবং ভবিষ্যতের ঘটনাবলী বর্ণনার জন্য এগুলো ব্যবহার করে আসছেন কিন্তু তারা এইসব হাদিসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন নন। তাই এইখানে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা কেবল সহীহ হাদিস এবং কেবলমাত্র সহীহ হাদিস হতেই আমরা সঠিকভাবে (কোন বিষয়ের) ধারণা লাভ করতে পারি।

ঘটনার একটি সাধারণ ধারাবাহিকতা হবে নিম্নরূপঃ

- মুসলিমগণ ও রুম-এর মাঝে একটি চুক্তি থাকবে এবং তারা উভয়ে এক সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।
- সেই সাধারণ শত্রুটির পরাজয় হবে এবং মুসলিম এবং রুম পরষ্পর যুদ্ধ করবে, খুব সম্ভব রুম-এর মিত্রদের সাথে একই কাতারে।
- সেই সময়ে মুসলিমরা শামের আশপাশের এলাকায় অবস্থান করবেন যাদের শক্ত ঘাঁটি হবে দামাস্কাস-এর নিকটবর্তী ঘোতায়।
- রুম মুসলিমদের দাবিক বা আল আ'মাক-এ আক্রমণ করবে।
- অবশেষে একটি প্রচন্ড যুদ্ধের পর মুসলিমরা রুম-কে পরাজিত করবে এবং তাদেরকে সরিয়ে একদম ইস্তাম্বুল পর্যন্ত নিয়ে যাবে এবং ইস্তাম্বুল মুসলিমদের করায়ত্ব হবে।
- দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং মানবজাতির ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পরীক্ষার দিন শুরু হবে।

পুনশ্চ

এই ছোট্ট বইটি লেখার কথা আমার মনে হয় যখন আমি ধারাবাহিকভাবে দাজ্জাল সম্পর্কে কয়েকটি বক্তব্য দেই। কয়েকজন ভাই আমাকে বলেন আমি যেন শেষ দিবসের অন্যান্য ঘটনাবলী নিয়ে একটি ধারাবাহিক বর্ণনা করি, বিশেষ করে যেই সময়ে মুসলিমরা রোমানদের সাথে যুদ্ধ করবে। সেই সময় পর্যন্ত আমি রুম কে হবে তা নিয়ে বিভিন্ন মতামত শুনে এসেছি যেগুলো যৌক্তিক হতে শুরু করে একেবারে অবান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যারা আমাকে রুম সম্পর্কে বলতে বলেছিল তাদের আমি জিজ্ঞাসা করি রুম সম্পর্কে তাদের মতামত কি। তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ধারণা ছিল যার একটির সাথে অপরটির মিল ছিলনা। আমি অবাক হয়ে গেলাম যে কিভাবে একই বই থেকে পড়ার পরও মতের এমন অমিল হয় যেখানে প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব ধারণাকে শক্তভাবে প্রমাণ করতে প্রস্তুত। আমি এই ব্যাপারে উলামাদের লেখাগুলোর দিকে দৃষ্টিপাতের সিদ্ধান্ত নিলাম কিন্তু দেখলাম ক্লাসিক্যাল স্কলারদের লেখায় খুব অল্প তথ্য বিদ্যমান কারণ তাঁদের সময়ে বাইযিন্টিনিয় সাম্রাজ্য তখনো বিদ্যমান ছিল।

আমি কুরআন ও সুন্নাহতে এই ব্যাপারে যা কিছু আছে তার সবই গবেষনা করেছি এবং আমি জেনেছি যে মুসলিমরা রুম সম্পর্কে যা ধারণা করে তার সবই অমূলক এবং তা অজ্ঞতা ও ভুলে ভরা গুটিকয়েক ইসলাম প্রচারকারী ব্যাক্তিদের তথ্য হতে প্রাপ্ত। ইতিহাসবিদ হিসেবে আমি রুম-এর ইতিহাস সঠিকভাবে বিশ্লেষন করতে সক্ষম হই। সেই সাথে রুম-এর উৎস ও সংজ্ঞায়িতকরণের বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে বুঝতে সক্ষম হই। আমি সাথে সাথে দেখতে পাই যে কেবল একটি জাতিরই রুম হবার সম্ভাবনা আছে। আমি এই ব্যাপারটি পুনরায় পরীক্ষা করলাম যে অন্যরা একই মতামত পোষন করেন কিনা। আমি জানলাম যে আমাদের সময়ে অনেকেই এই ব্যাপারে একমত যে তুরস্কই আমাদের সময়ের রুম যদিও এই মতামতটি তেমন বেশি প্রচার হয়না এবং এর ব্যাপারে তেমন আলোচনা হয়না (আসলে এই প্রসঙ্গে আলোচনাও খুব কমই হয়) এবং তাই এই মতামতটিও শিখানো ও ব্যাখ্যা করাও হয়না।

এই বইটি লিখার পর আমি বেশ কয়েকজন স্কলার, শিক্ষক এবং বিশ্বস্ত বন্ধুর সাথে কথা বলেছি এই বিষয়ে তাদের মতামত নেবার জন্য। প্রথমে আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম আমাদের সময়ে রুম-এর পরিচয় সম্পর্কে তাদের মতামত কি এবং আমি যা উত্তর পেলাম তা মোটেও অপ্রত্যাশিত ছিলনা। বেশিরভাগই বলেছেন তারা জানেননা অথবা তারা সাথে সাথে কিছু উত্তর দিয়েছেন যার দলিল তাদের কাছে নেই বলে তারা স্বীকার করেছেন। এরপর আমি হয় তাদেরকে আমার মতামত ব্যক্ত করি নয়ত এই বইটি পড়তে দিই। আমি নিশ্চিত হয়েছি যে আমি যাদের সাথে কথা বলেছি তাদের

প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে একমত যে আমার সিদ্ধান্ত সঠিক এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য আমি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছি তা যুক্তিসঙ্গত। আমাকে বেশিরভাগই অনুরোধ করেছেন যে আমি যেন অতি দ্রুত এই বই প্রকাশ করি এবং সে সাথে যত বেশি সংখ্যক ভাষায় সম্ভব যেন অনুবাদ করাই। আমি তাই আশা করি যেন যদি কেউ এই বইটি সঠিকভাবে তার নিজস্ব ভাষায় অনুবাদ করতে সক্ষম হন তবে তিনি যেন তা করেন এবং আমাকে দয়া করে এর একটি কপি পাঠাবেন রেফারেন্স-এর জন্য।

আমি বিনীতভাবে ক্ষমা চাই যে এই বইটিকে আমি সহজপঠ্য করে তুলতে পারিনি। আমি এখনো বিশ্বাস করি যে এটির আরও উন্নতির প্রয়োজন আছে কারণ আমি এটি এমন একটি সময়ে লিখেছি যখন আমি এর প্রতি যথাযথ মনযোগ দিতে সক্ষম হইনি। আমি চেষ্টা করব এটি রিভিশন দেবার এবং সম্ভব হলে আরো সহজ স্টাইলে পুনঃপ্রকাশ করার জন্য ইনশাআল্লাহ্।

আমার আরো বলা প্রয়োজন যে অ্যানাটোলিয়ায় বসবাররত বা অ্যানাটোলিয় বংশোদ্ভুত কেউ যদি এই বই পড়ে থাকেন এবং বিব্রত হন তবে দয়া করে বুঝার চেষ্টা করুন যে এই এই বইটি কোনভাবেই অ্যানাটোলিয়ানদের হেয় করার জন্য নয় বা তাদের সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু বলার উদ্দেশ্যেও নয়। অ্যানাটোলিয় মুসলিমরা ঐতিহাসিকভাবে ইসলামের মহান রক্ষনাবেক্ষনকারী এবং তাদের মধ্য হতে এই উম্মাহর অনেক মহাপুরুষের আগমন হয়েছে। দুঃখজনকভাবে আমাদের সময়ে আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের কারণে এবং সেক্যুলারিস্ট এজেন্ডা অ্যানাটোলিয়ার জনগণের উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়ার কারণে ইসলাম আর আইনের উৎস হিসেবে বিদ্যমান নেই এবং সত্যিকারের মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ ঘোষনা করা হয়েছে এবং তাদের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। উসমানী সাম্রাজ্যকে একটি ‘মুসলিম রুম’ এ পরিণত করার মুহাম্মাদ আল ফাতিহ-এর উদ্দেশ্যকে মুনাফিকেরা ছিনতাই করে নেয় এবং একে একটি কামালিস্ট ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করে যা ইসলামিক রাষ্ট্রের বিপরীতধর্মী মতবাদ। ঠিক সেইভাবে অ্যানাটোলিয়ান মুসলিমেরা, যারা চান যে তাদের দেশকে আল্লাহর আইন দিয়ে পরিচালনা করা হোক, মুসলিমদের শত্রু নন। বরং তারা সকলে একই জামায়াতের লোক এবং আমরা স্বাভাবিকভাবে আমাদের সময়ের রুম-এর বিরোধী যা কুফর আইন দ্বারা পরিচালিত এবং যা তার স্বভাবজাতভাবেই তাওহীদবাদীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। তাই প্রতিটি অ্যানাটোলিয়াবাসীর নিজেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা কি মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বাধীন মুরতাদ-দের সাথে থাকবেন নাকি মুসলিমদের সাথে থাকবেন যারা কেবল আল্লাহরই উপাসনা করেন এবং তাঁর প্রদত্ত আইন দ্বারাই শাষন করেন।

আমি দুআ করি যেন এই লেখাটি কল্যানজনক হয় এবং যেন তাঁদের কাছে পৌঁছায় যারা এ থেকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হতে পারবেন। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি এই

উম্মতের বিজয়ের জন্য এবং তিনি যেন জামাত-আল-মুসলিমিনকে এক ইমামের অধীনে একত্রিত করে তাদেরকে বিজয় দান করেন।

আমার সব কাজ ফ্রি এবং একে পুনঃবিতরণ করা যাবে যদি কোনভাবে এর কোন পরিবর্তন সাধন করা না হয়।

ইনশাআল্লাহ্ আমি ঐতিহাসিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আরো লেখালেখি করব, সেই সাথে বর্তমান সময়ের ও শেষ দিবসের বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়েও। আমি চেষ্টা করব আমার লেখাগুলোকে ফ্রি করে রাখার কিন্তু কেউ যদি আমাকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করতে পারেন তবে আমার সাথে নিম্নোক্ত ই-মেইল এড্রেসে যোগাযোগ করবেন। এই ধরণের সাহায্য লেখালেখি ও শিক্ষকতা চালিয়ে যাওয়ার জন্য জরুরী। এই ধরণের সাহায্য অন্যান্য মিডিয়ার ব্যাবহারের মাধ্যমে কল্যাণকর ও উপকারী লেখাগুলোর বিস্তারের কাজে সাহায্য করবে। আমি দুআ করি আল্লাহ তাদেরকে যেন পুরষ্কৃত করেন যারা জান্নাতে একটি জায়গার চেয়ে কম দিয়ে সাহায্য করেননা। যদি আপনারা সাহায্য করতে চান তবে এর যথাযথ বন্দোবস্তের জন্য দয়া করে নীচের ইমেইল এড্রেসে আমার সাথে যোগাযোগ করুন। এছাড়াও যেকোন ফিডব্যাক, কমেন্ট, সাজেশন, প্রশ্ন বা সমালোচনা থাকলে তা ইমেইল-এর মাধ্যমে জানাতে পারেন। আমি চেষ্টা করব প্রতিটি ইমেইল-এর জবাব দেবার জন্য।

whoisrum@gmail.com

মুসা সেরান্টোনিও – ৩০ রবিউস সানি ১৪৩৬